স্বতঃ পরতঃ তাঁহার অনিষ্টসাধনের চেষ্টা করিতেন। একদা কতকগুলি দণ্ডী তুলসীদাসের আশ্রমে গিয়া তাঁহাকে তিরস্কারপূর্ব্বক কহিলেন ;—আপনি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। কোনও বাহ্য পদার্থে সন্ন্যাসীর প্রয়োজন নাই। সন্ন্যাসীর পক্ষে লোকসঙ্গ, দানগ্রহণ, আতিথ্যপালন প্রভৃতি বিষবৎ পরিহার্য্য। কিন্তু আপনি সর্ব্বদা জনসঙ্ঘে বেষ্টিত থাকেন; কেহ দান করিলে, প্রত্যাখ্যান করেন না। আতিথ্যের জন্ম ভাণ্ডার সজ্জিত রাখেন। এ সকল আপনার পক্ষে নিতান্ত অকার্য্য বলিয়া আমাদের মনে হয়।

তুলসী তাঁহাদের যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া, দীনভাবে কহিলেন ;—আপনারা যাহা কহিলেন, সত্য। সন্ন্যাসীর অর্থে ও জনসঙ্গে প্রয়োজন নাই। ভোগবাসনা সন্ন্যাসীর পক্ষে যথার্থই হলাহল। আমি মূঢ়, বুদ্ধিবিবেকহীন, আপনাদের পদধূলির যোগ্য নহি, অচিন্ত্যশক্তি, অবাঙ্মনসগোচর পরমাত্মার নিগূঢ়তত্ত্ব আমি কি বুঝিব? আমার সামান্য জ্ঞানে ঈশ্বরের দুইটীমাত্র বিভূতি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। সেই দুই বিভূতি—দয়া ও মঙ্গলভাব। তিনি দয়াময় ও মঙ্গলময়, এইমাত্র জানিয়াই তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছি। যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাঁহার অসীম দয়া ও মঙ্গলভাব দর্শন করি। যে পদার্থেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, দেখিতে পাই,— সেই করুণাসিন্ধুর অবিচ্ছিন্ন কৃপারাশি সর্ব্বত্রই বিকীর্ণ। জড়, চেতন, স্থূল, সূক্ষ্ম, চরাচর, সর্ব্বত্রই সেই বিরাট্ পুরুষের করুণামূর্ত্তি জাজল্যমান! বিশ্বকাণ্ডের উপাদান পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিতি-অপ্-তেজ মরুৎ-ব্যোম) নিরন্তর কেবল পরোপকারে নিযুক্ত। ভূতকল্যাণই পঞ্চভূতের প্রকৃতি, এ জন্য সাধুগণ পরোপকারকে সনাতন ধর্ম্ম বলিয়াছেন।

"অদ্রোহঃ সর্ব্বভূতেষু কর্ম্মণা মনসা গিরা।
অনুগ্রহশ্চ দানং চ সতাং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।"

—কায়মনোবাক্যে পরপীড়াবর্জ্জন, দয়া, দান, ইহাই সাধুর সনাতন ধর্ম্ম। যিনি কর্ম্মক্ষেত্র পরিহারপূর্ব্বক, একাকী বিজনে যোগানন্দ উপভোগ করেন, তিনি ভাগ্যবান্ সন্দেহ নাই। কিন্তু যিনি লোকমধ্যে থাকিয়া ঈশ্বরে মনপ্রাণ সমাধানপূর্ব্বক, অনাসক্তভাবে জীবকল্যাণ সাধন করেন, ঈশ্বরপ্রসাদলব্ধ নিজ আনন্দকে শত শত নিরানন্দ জীবগণমধ্যে বিতরণ করেন, তিনি অধিকতর ভাগ্যবান্। ভূমানন্দের ন্যায় মিষ্ট পদার্থ আর নাই। "একঃ স্বাদু ন ভুঞ্জীত"—মিষ্ট একা খাইতে নাই। আনন্দকে যতই বণ্টন করিবে, আনন্দের মর্য্যাদা, পরিমাণ ও সাফল্য ততই বর্দ্ধিত হইবে, এবং সেই সঙ্গে বণ্টনকারীর আত্মপ্রসাদ উচ্ছলিত হইবে। বিপুল জলরাশি তড়াগগর্ভে আবদ্ধ রহিয়াছে, অথচ জলাভাবে সন্নিহিত শস্যক্ষেত্র সকল বিশুষ্ক হইতেছে, ইহা অতি শোচনীয় দৃশ্য! সেই জলরাশিকে সমন্তাৎ বিকীর্ণ করিয়া, মৃতপ্রায় শস্যসকলকে উজ্জীবিত ও ফলশালী করাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত। পরার্থে যিনি জীবন দান করেন, ভগবান্ স্বহস্তে তাঁহার

সৎকার করেন। মহাত্মা জটায়ু, দয়াবীর জীমূতবাহন, দানবীর শিবি দধীচি প্রমুখ সাধুগণ পরার্থে দেহ দান করিয়া, যে মহিমা প্রদর্শন করিয়াছেন, কোটিকল্প তপস্যা দ্বারা তাহা লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। অদ্বৈত ভক্তিযোগে সর্ব্বভূতের কল্যাণসাধনকে আমি সার ধর্ম্ম জ্ঞান করিয়াছি।

আমি জ্ঞানহীন। আপনারা আমার গুরু। এ দাসকে এই আশীর্ব্বাদ করুন, যেন সেই দীনদয়াল পতিতপাবন রামচন্দ্রকে নিমেষার্দ্ধও বিস্মৃত না হই।

দণ্ডিগণ তুলসীদাসের তাদৃশী ভক্তি ও দীনতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, তদবধি তাঁহার প্রতিকূলাচরণে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন।

মহাত্মা তুলসীদাসের কথাগুলি সার সত্য। স্বার্থের জন্য দান গ্রহণ যেমন বিষতুল্য, পরার্থে দান গ্রহণ তেমনি অমৃততুল্য। শ্রদ্ধাদত্ত দান গ্রহণ পূর্ব্বক, তদ্দ্বারা অনশনমুমূর্ষুর প্রাণরক্ষা বা বিপন্নের বিপদুদ্ধার, গৃহী ও সন্ন্যাসীর সমান কর্ত্তব্য। যে সুধাময় আলোক দ্বারা চন্দ্রমা ভুবনমণ্ডলকে আলোকিত ও পুলকিত করিতেছেন, পৃথিবীকে সরস করিয়া উদ্ভিজ্জ জগৎকে জীবিত ও জীবের প্রাণনাড়ীকে পরিপুষ্ট করিতেছেন, সে আলোক তিনি সূর্য্যের নিকট গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিশ্বহিতে সে দানগ্রহণ করায় চন্দ্রমা কি নিন্দনীয়? স্বয়ং নিস্পৃহের পক্ষে দান গ্রহণ করা বা না করা একই কথা; তাঁহার পক্ষে পরমান্নভোজন ও শুষ্কপর্ণভক্ষণ একই কথা; তাঁহার পক্ষে অট্টালিকার মহার্হ শয্যা বা গিরিগুহায় প্রস্তরশয্যা একই কথা। তাঁহার পক্ষে কাচ-কাঞ্চন, পুরীষ-চন্দন, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, সম্রাট্ দরিদ্র সকলি সমান।

ভক্তিসুধাদানে পাতকীর পরিত্রাণ, অন্নজলদানে ক্ষুধার্ত্তের ও তৃষ্ণার্ত্তের ক্ষুৎপিপাসাশান্তি, নামামৃতসেচনে সকলের সর্ব্বপাপক্ষালন,—এ সকলের জন্য সন্ন্যাসীর লোকসহবাস দূষণীয় নহে। ঈশ্বরে কর্ম্মফলসন্ন্যাসই প্রকৃত সন্ন্যাস।

"বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং
গৃহেঽপি পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ত্ততে
নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্॥

—বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা বনে গিয়া বাস করিলেও, তাঁহাদের নানা দোষ ঘটিয়া থাকে; তাঁহাদের তপঃসাধন হয় না। পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়া, গৃহে বাস করিলেও, তপঃসিদ্ধি হয়। ফল কথা,—যিনি বীতরাগ হইয়া সদাই পুণ্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত, তাঁহার পক্ষে গৃহই তপোবন।

সদুদ্দেশ্যে ঈশ্বরকৃপায় নির্ভর করিয়া কর্ম্ম না করিলে, প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। ভগবান্, কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি, সৎকার্য্যের জন্যই, মানবকে দান করিয়াছেন। তাঁহার এই অমূল্য দানকে সার্থক করাই মনুষ্যত্ব। পরোপকার যে সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম, তাহা অচেতনেরাও প্রতিপন্ন করিতেছে। দেখ! জীবলোককে অন্ন দিবার জন্যই ওষধীরা আত্মপোষণ ও

আত্মবিনাশ স্বীকার করিতেছে (১)। চন্দ্রমা দেবলোককে অমৃত দিবার জন্যই আত্মাকে ক্ষয় করিয়া থাকেন (২)। দীপ-বর্ত্তিকা পলে পলে আপনাকে দগ্ধ করিয়া, লোককে আলোক দিয়া থাকে। চন্দন-তরুকে তুমি যতই ছেদন কর, ভেদন কর, পেষণ কর, বা দহন কর, সে তোমাকে ততই অপূর্ব্ব পরিমল দানে তৃপ্ত করিবে। সাধুরা প্রাণান্তেও পরোপকার ব্রত ত্যাগ করেন না।

দান করা ও গ্রহণ করার ফলাফল, দাতা ও গৃহীতার হৃদয়ভাবের উপর নির্ভর করে। পরার্থে দান গ্রহণ করিতে হইলেও প্রথমে দাতার হৃদয় পরীক্ষা করা উচিত। তিনি যথার্থ শ্রদ্ধার সহিত দিতেছেন কিনা, দেখা উচিত।

"অবজ্ঞয়া ন দাতব্যং কস্মৈচিৎলীলয়াপি বা।
অবজ্ঞয়া কৃতং হন্যাৎ দাতারং নাত্র সংশয়ঃ ॥"
(রামায়ণ।)

—অবজ্ঞায় বা অশ্রদ্ধায় কাহাকেও দান করিতে নাই। অবজ্ঞায় দান করিলে, তাহা দাতার বিনাশের কারণ হয়।

ভগবানে কর্ম্মফল অর্পণপূর্ব্বক, ভগবৎ-প্রীতিকামনায় দান করায় ও দান গ্রহণ করায়, উভয়েরি মঙ্গল। ব্রহ্মই দাতা এবং ব্রহ্মই গৃহীতা, আমি উপলক্ষ্যমাত্র; যাঁহার প্রীতিতে বিশ্বের প্রীতি, সেই বিশ্বপ্রাণ—বিশ্বের হৃদয়ানন্দ ভগবান্ এই কার্য্যে প্রীত হউন,—এই ভাবে দানাদি কার্য্য সম্পন্ন হইলে, তাহাকে "ব্রহ্মার্পণ" বলে। কূর্ম্মপুরাণে ব্রহ্মার্পণের কথা এইরূপ আছে;—

"ব্রহ্মণা দীয়তে দেয়ং ব্রহ্মণে সম্প্রদীয়তে।
ব্রহ্মৈব দীয়তে চেতি ব্রহ্মার্পণমিদং পরম্ ॥
নাহং কর্ত্তা সর্ব্বমেতদ্ ব্রহ্মৈব কুরুতে তথা।
এতদ্ ব্রহ্মার্পণং প্রোক্তমৃষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥
প্রীণাতু ভগবানীশঃ কর্ম্মণানেন শাশ্বতঃ।
করোতি সততং বুদ্ধ্যা ব্রহ্মার্পণমিদং পরম্ ॥
যদ্বা ফলানাং সন্ন্যাসং প্রকুর্য্যাৎ পরমেশ্বরে।
কর্ম্মণামেতদপ্যাহুর্ব্রহ্মার্পণমনুত্তমম্ ॥"

—যাহা কিছু দিবার, তাহা আমাকে ব্রহ্মই দিতেছেন, আমিও ব্রহ্মকেই সম্প্রদান করিতেছি; আমি যাহা কিছু সম্প্রদান করিতেছি, সে সকলি ব্রহ্ম—এইরূপ জ্ঞানকে ব্রহ্মার্পণ বলে। আমি কিছুই করি না, সকলি ব্রহ্ম করিতেছেন—এই-রূপ জ্ঞানকে তত্ত্বদর্শী ঋষিরা 'ব্রহ্মার্পণ' বলিয়া থাকেন। এই কার্য্যে সেই সনাতন ঈশ্বর প্রীত হউন,—সতত এইরূপ বুদ্ধিতে কার্য্য করাকে 'ব্রহ্মার্পণ' বলে। কর্ম্মফল ব্রহ্মেই অর্পণ করিলাম,—ইহাকে সর্ব্বোত্তম 'ব্রহ্মার্পণ' বলে। "অহং করোমীতি বৃথা-ভিমানঃ"—আমি করিতেছি, এ অভিমান

---

(১) 'ওষধী'—ফলপাকান্ত উদ্ভিদ্। "ওষধ্যঃ ফলপাকান্তাঃ" অর্থাৎ ফল পাকিলে যাহারা মরিয়া যায়, সেই সকলকে ওষধী বলে; যথা ধান্য, কলাই প্রভৃতি। ধান ও কলাই পাকিলেই গাছ মরিয়া যায়।

(২) পুরাণে কথিত আছে, ইন্দ্রাদি দেবগণ প্রতিদিন পর্য্যায়ক্রমে চন্দ্রের এক এক কলা ভক্ষণ করেন। দেবকৃপায় শুক্লপক্ষে চন্দ্রমা আবার পূর্ণ হন।

বৃথা। ঈশ্বর কখনও দাতার বেশে আসিয়া হাত তুলিয়া দান করিতেছেন, আবার কখনও গৃহীতার বেশে আসিয়া হাত পাতিয়া দান গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার অচিন্ত্য লীলা! মূঢ় মানব কি বুঝিবে?

পাপী তাপী যাঁহার প্রাণের বন্ধু, পাপী তাপীকে দেখিলে, যাঁহার করুণাসাগর উদ্বেলিত হয়, ভগবানের জগন্মঙ্গল নামামৃত দান করিয়া, ভগবৎকথা শুনাইয়া, যিনি অগণিত তাপিতের দগ্ধ হৃদয় শীতল করেন, অমৃতময় নব জীবন দান করিয়া লোকের রোগ, শোক, ভয়, উৎকণ্ঠা, জরা, মৃত্যু হরণ করেন, তিনি নররূপী ঈশ্বর, সকলের নমস্য ও উপাস্য। ঈশ্বর স্বয়ং অনাদি, অবিনাশী, অবিকারী, অরূপ, নির্লেপ হইয়াও, অধর্ম্মের সংহার ও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা জন্য স্বেচ্ছায় ও স্বশক্তিবলে বিশুদ্ধা, ঊর্জ্জিতা, সাত্ত্বিকী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রাম-কৃষ্ণ বুদ্ধ-চৈতন্য-খৃষ্টাদিরূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হন। লোকসমাজে এক একটী বিপ্লব ঘটিলে, তাহার শান্তিবিধানই ভগবানের এরূপ জন্ম-কর্ম্ম স্বীকারের উদ্দেশ্য। ব্রহ্মবল ও ক্ষত্রবল এই দুই বলের সামঞ্জস্যভাবে সম্মিলনেই লোকসমাজ রক্ষিত হয়। এই সামঞ্জস্য ভগ্ন হইলে বিপ্লব উপস্থিত হয়। যখন ক্ষত্রিয় বল ব্রহ্মবলকে পদদলিত করিয়া নরসমাজকে বিধ্বস্ত করিতে লাগিল, তখন ভগবান্ পরশুরাম ক্ষত্রিয়কুলের কালরাত্রিরূপে উদিত হইয়া, সে বিপ্লব নিবারণ করিলেন। যখন বীভৎস তান্ত্রিকতার অত্যাচারে সুরাপান, ব্যভিচার, জীবহিংসা প্রভৃতি মহাপাপের স্রোত প্রবাহিত হইল, মনুষ্যই পিশাচত্বে পরিণত হইল, অধিক কি? দিবাভাগে প্রকাশ্য স্থানে নরবলি হইত, এবং সেই নরমাংস প্রকাশ্য ভাবে বিক্রীত ও ভক্ষিত হইত। তখন দয়াময় ঈশ্বর বুদ্ধশরীরে অবতীর্ণ হইয়া সে পাপস্রোত নিবারণ করিলেন। এইরূপে জগতে যে যে সময়ে ধর্ম্মের পতন ও অধর্ম্মের উত্থান হয়, ভগবান্ দেশ, কাল ও অবস্থার অনুরূপ মূর্ত্তি ও বিভূতি সহ প্রকটিত হইয়া বিপ্লব-নিবারণপূর্ব্বক সমাজকে গন্তব্য পথে পরিচালিত করেন।

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

—এ ভগবদ্বাক্য অব্যভিচারী নিত্য সত্য। এ আশ্বাসবাণীতে যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা ঘোরতর বিপ্লবেও বিচলিত হন না। তাঁহারা ধর্ম্মপ্রাণ হইয়া সংযতভাবে ও নিঃশব্দে কর্ত্তব্য পালন করেন। অনাবৃষ্টি-কাতর কৃষক যেমন যথাবিধি ক্ষেত্র কর্ষণাদি পূর্ব্বক সতৃষ্ণনয়নে জলধরের প্রতীক্ষা করে, তাঁহারাও তেমনি সাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া একাগ্র হৃদয়ে সেই সঙ্কটহারীর শুভাগমন প্রতীক্ষা করেন।

চৈতন্যদেব ও তুলসীদাস এ উভয়ের আবির্ভাব প্রায় পঞ্চ শতাব্দীর কথা। সে সময় সমগ্র ভারতে, বিশেষতঃ নবদ্বীপ, বারাণসী প্রভৃতি হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থান

সমূহে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রবল আধিপত্য। কঠোর শাস্ত্রানুশাসন ও গুরুতর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা। দুর্ব্বলেরা প্রায়শ্চিত্তে অক্ষম হইলে, জাতিচ্যুত হইত। সে সময় ভারতের সর্ব্বত্র যবন সম্রাটের আধিপত্য। রাজবলে বলীয়ান্ যবনেরা ছলে বলে হিন্দুগণকে ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিত। প্রায়শ্চিত্তে অক্ষম জাতিভ্রষ্টগণের অনেকে স্বেচ্ছায় ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিত। আড়ম্বরপূর্ণ, নীরস, কর্কশ তার্কিকতার ও দাম্ভিকতার আধিপত্যে লোকের ভক্তিভাব বিশীর্ণ হইতেছিল। "বিদ্যা দদাতি বিনয়ং"—পণ্ডিত-সম্প্রদায়ে ঠিক্ ইহার বিপরীত ফল দৃষ্ট হইত। সমাজে বিচারমল্ল দাম্ভিক পণ্ডিতগণের সমাদর অধিক হইত। যিনি শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মজ্ঞ, অথচ তার্কিকতায় অক্ষম, এরূপ পণ্ডিতের সমাদর অল্পই ছিল। অনেকে আপনাকে "সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ অভ্রান্ত" বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এই ধর্ম্মবিপ্লবকালে, করুণাময় ঈশ্বর, প্রেমভক্তিবিমুখ জনগণের পরিত্রাণের জন্য, ভারতের দুই প্রধানতম কেন্দ্রে দুই মহাপুরুষকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারাই—ভগবান্ চৈতন্যদেব ও ভগবান্ তুলসীদাস।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবকাল ১৫৪২ সংবৎ। তুলসীদাসের আবির্ভাবকাল ১৫৮৯ সংবৎ। চৈতন্যদেবের লীলাকাল ৪৮ বৎসর। অতএব এ ভূলোকে উভয়েই যুগপৎ এক বর্ষকাল বিদ্যমান ছিলেন। সমকালে একের উদয় ও অপরের অস্তগমন কি অপূর্ব্ব দৃশ্য!

"যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনাম্
আবিষ্কৃতারুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ।"
—নিশাশেষে নিশানাথ চলিছে চরমাচলে,
নব ছবি ধরি রবি উদিছে গগনতলে!

চৈতন্যচন্দ্রের পার্থিব মূর্ত্তি অস্তমিত হইল বটে, কিন্তু তিনি ধরাতলে যে অপার্থিব, প্রেমময় বিগ্রহ স্থাপন করিলেন, তাহার চরণে জগতের নরনারী অনন্তকাল বিলুণ্ঠিত হইবে। ভক্তিপুষ্পে হৃৎপাত্র ভরিয়া তাহার পূজা করিবে। প্রেমাশ্রুধারায় নিত্য তাহার অভিষেক করিবে, এবং সেই বিগ্রহের পদতলে আত্মবলি দিয়া, ভক্তেরা মহানির্ব্বাণলাভ করিবে।

(ক্রমশঃ)

রাজপুত রাজগৃহের একটী পারিবারিক চিত্র।

মিবারের অধীন সাধরীর সামন্তরাজ স্বীয় শয়ন প্রকোষ্ঠে বিশ্রাম সুখ সেবা করিতেছেন। রজনী দ্বিতীয় প্রহর অতীত প্রায়। রাজপুরী নীরব নিস্তব্ধ। কেবল মধ্যে মধ্যে প্রহরিবর্গের গগনভেদী বিকট চিৎকার শুনিতে পাওয়া যাইতেছে।

নিম্নভাগে পরিখারূপিণী কৃষ্ণবেণী কলকল শব্দে প্রকৃতির সেই গহন গম্ভীর

নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। সৈনিকের কোলাহল নাই; অশ্বের হ্রেষা রব নাই; সমরাস্ত্রের ঝনঝনা নাই। সকলেই নিদ্রাক্রোড়ে গা ঢালিয়া দিয়াছে। কিন্তু সাধরীরাজ এখনও সম্পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করিতে পারেন নাই। মিবারের ভবিষ্যৎ চিন্তা তাঁহাকে এখনও জাগরিত রাখিয়াছে। শৌর্য্য বীর্য্য এবং অধ্যবসায়ে সামন্তগণ মিবারপতির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বরূপ; আবার সাধরীরাজ সকলের অগ্রগণ্য। তিনি মিবারের মঙ্গলের নিমিত্ত প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন; আজীবন মহারাণার সেবায় স্বীয় বীরবপু নিয়োজিত রাখিয়াছেন। সেই জন্যই সাধরীরাজের এত চিন্তা তাঁহার কার্য্যের বিশ্রাম নাই। মনের শান্তি নাই। দুর্দ্দান্ত যবন সম্রাট্ হইতে কিসে মিবারের শান্তি রক্ষা হইবে, কিসে মিবারপতির বিপুল মান অব্যাহত থাকিবে, এই তাঁহার অহরহঃ চিন্তা। পিতৃপুরুষগণের বীরচরিত মনে উদিত হইতেছে সাধরীরাজের শত শত বীরবালা যাঁহারা জহর ব্রতে অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা মনে পড়িতেছে অমনি বীরহৃদয়ে কর্ত্তব্যতার ফোয়ারা বহিতেছে। সহসা প্রকোষ্ঠ দ্বার উন্মোচিত হইল। রাণী সরোজকুমারী চঞ্চল চরণে গৃহ প্রবেশ করিলেন।

সরোজের সতেজমূর্ত্তিতে কমনীয়তার অভাব ছিল না; কিন্তু কোমলতার ন্যূনতায় সেই প্রফুল্ল কমল নেত্র তৃপ্তিকর ছিল না। সে লাবণ্যে নয়ন ঝলসিয়া উঠিত, মনে ভয়ের সঞ্চার হইত।

সরোজকুমারীর সাহঙ্কার ব্যবহারে সাধরীরাজ মধ্যে মধ্যে বড়ই বিরক্ত হইতেন। তিনি মিবারেশ্বর মহারাণার দুহিতা এই গর্ব্বে পতিকুলের সকলকেই তৃণবৎ জ্ঞান করিতেন। অধিক কি, স্বীয় স্বামী সাধরীরাজও পদমর্য্যাদায় তাঁহার অপেক্ষা হীন, এইরূপ ভাবও মধ্যে মধ্যে তাঁহার গর্ব্বিত হৃদয়ে উদিত হইত। তাই এরূপ সাহঙ্কার পদক্ষেপ; সগর্ব্বে প্রবেশ। সাধরী সহসা প্রণয়িনীকে আগমন করিতে দেখিয়া চিন্তা ভুলিয়া গেলেন। যেন নির্জীব দেহে জীবন সঞ্চার হইল; শুষ্ক তরু মঞ্জরিত হইয়া উঠিল। মিবারের ভাবী চিন্তায় যে হৃদয় নিরাশার অন্ধকারে ডুবিয়া ছিল, তাহাতে সহসা শত চন্দ্রের আলোক উদ্ভাসিত হইল।

সাধরী আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া রাজকুমারীকে সমীপে বসাইলেন। পতির আদরে প্রণয়িনী পরিতুষ্টা হইলেন বটে, কিন্তু কপোলবিম্বিত গর্ব্বরেখা একবারে মুছিয়া গেল না। সাধরীর তাহাতে লক্ষ্য নাই। তাঁহার প্রেম তরল; সরল হৃদয়ে পত্নীর প্রেমপ্রবলতায় অণুমাত্র অবিশ্বাস নাই। জীবনসর্ব্বস্ব পতি, পত্নীপ্রেমগত পতির প্রতি কোন্ রমণী অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে পারে? সাধরীর হৃদয়ে সে চিন্তা আদৌ স্থান পাইল না। তিনি পিপাসায় আকুল। বহুক্ষণ প্রগাঢ় চিন্তায় কণ্ঠশোষ হইয়া সাধরী বারিপানে ব্যগ্র হইয়া কহিলেন;—"রাণাবৎজি * একপাত্র জল

* উদয়পুরের মহারাণা কুমারীকে সম্বোধন করিতে হইলে রাণাবৎজি বলিতে হয়।

দাও।" গর্ব্বিতা সরোজকুমারীর কঠোর হৃদয়ে সে আদেশ বজ্রসম প্রবেশ করিল। তিনি অহঙ্কারে বলিয়া উঠিলেন, মহারাজ! মনে রাখিবেন আমি মিবারেশ্বর মহারাণার দুহিতা, আপনার ন্যায় শত শত সামন্ত মিবারপতির প্রসাদলাভে ব্যগ্র রহিয়াছে। মিবাররাজনন্দিনী কাহাকেও জল দিবার জন্য জন্মগ্রহণ করে নাই।

কথাগুলি সাধরীর হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়া গেল, মর্ম্মে যাতনা দিতে লাগিল। এ কঠোর কথা রাজপুতপ্রাণে সহ্য হইবার নহে। সাধরীর নয়নে অনলকণা ছুটিতেছে; হৃদয়ে দাবাগ্নি জ্বলিতেছে; হস্ত অসি অন্বেষণে প্রসারিত হইতেছে; সাধরী আত্মহারা। সরোজকুমারী প্রাণভয়ে আকুল হইয়া পলায়নের পথ দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্ষমা ও ধৈর্য্যের অবতার সাধরীরাজ মুহূর্ত্তমধ্যে প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন,—"অবলা পলায়ন করিও না; সাধরী এত পাষণ্ড নহে যে, অবলার প্রতি বল প্রকাশ করিবে। কিন্তু আজি হইতে আমাদের পতি-পত্নীসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। যে রমণী পিপাসাতুর পতিকে জল দিতে অপমান জ্ঞান করে সে পত্নীর অযোগ্যা, তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকাই শ্রেয়ঃ। তোমাকে আদেশ করিতেছি যে, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই তোমাকে আমার অধিকার পরিত্যাগ করিতে হইবে।"

সরোজকুমারীর গর্ব্বিত হৃদয় এইবার গলিয়া গেল। পতির সগর্ব্ব ক্ষমাপূর্ণ ব্যবহারে তাঁহার প্রাণে অনুতাপের অনল জ্বলিয়া উঠিল। সাধরীরাজকে তখন তাঁহার রাজরাজেশ্বর বোধ হইতে লাগিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, যদি প্রিয় পতির অসির আঘাতে মরিতে পারিতেন, তবে তাঁহাকে যাতনার তীব্র বিষে পুড়িতে হইত না। বাস্তবিক সাধরী যদি এরূপ ক্ষমা প্রদর্শন না করিয়া পত্নীর প্রতি পরুষ ভাষা প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইলে সরোজকুমারীর এত যাতনা হইত না; তাঁহার গর্ব্বিত হৃদয়ের অহঙ্কার স্রোত আরও উথলিয়া উঠিত। সরোজকুমারী পাগলিনী।

রজনী অবসান হইতে না হইতেই সরোজকুমারী উদয়পুরে প্রেরিতা হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত ঘটনাবাঞ্জক লিপিও প্রেরিত হইল। মহারাণা অবনত মস্তকে লিপি পাঠ করিলেন। তাঁহার প্রশান্ত নয়নে কালিমা-রেখা পড়িল, প্রফুল্ল বদন বিবর্ণ হইল। অবিলম্বে বৃহৎ দরবারের আদেশ প্রদত্ত হইল। সভাস্থলে জনসাধারণের আমন্ত্রণ হইল।

দেখিতে দেখিতে দরবারের নির্দ্দিষ্ট দিন আগত হইল। শত শত সামন্ত নৃপতি সভাগৃহ আলোকিত করিলেন। রাজসভা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। আজি মিবারের জনসাধারণ সভাতলে সমাগত। মহারাণা সর্ব্বোপরি তারকা-বেষ্টিত শশধরের ন্যায় রত্নাসনে উপবিষ্ট। উভয় পার্শ্বে সামন্তবৃন্দ তারাকারে রাজসিংহাসন বেষ্টন করিয়া আছেন। সম্মুখে প্রজাসাধারণ। উপরে যবনিকামধ্যে নারীগণ।

সভার অপূর্ব্ব দৃশ্যে সকলে মোহিত। কিন্তু আর একটী ইহা অপেক্ষাও অপূর্ব্ব দৃশ্যে সকলে মুহ্যমান হইয়াছে, আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতেছে, এবং স্তম্ভিত হইয়াছে। মিবারের ভাবী যুবরাজ, সাধরীরাজের পাদুকা মস্তকে ধারণ করিয়া অবিচলিতচিত্তে সকলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। এই অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া সমস্ত লোকে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় হইয়াছে। কিন্তু কাহারও সাধ্য হইতেছে না যে মহারাণাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করে। মিবারের চিরন্তন প্রথা এই যে, সভায় প্রবেশ করিতে হইলে সকলকে নগ্নপদে প্রবেশ করিতে হয়। সামন্ত ভূপতিবর্গ নগ্নপদে প্রবেশ করিলে রাজ প্রহরিগণ সযত্নে তাঁহাদের পাদুকা রক্ষা করিয়া থাকে। অদ্য সেই নিয়মে প্রহরিবর্গ সামন্ত রাজাবলীর পাদুকা রক্ষা করিতেছে। কিন্তু সাধরীরাজের পাদুকা-রক্ষণে স্বয়ং রাজকুমার নিযুক্ত হইয়াছেন। কুমার ভগ্নীপতির সম্মান রক্ষার নিমিত্ত সেই পাদুকাযুগল মস্তকে ধারণ করিয়া আছেন। অবোধ ললনাকুলে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে; প্রজাবর্গ বিমর্ষ হইয়াছে। সকলেরই মুখে বিষাদের চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। অবশেষে সাধরীরাজ আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি মহারাণার দক্ষিণে অতি সম্ভ্রান্ত আসনে সমাসীন হইয়া আপনাকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করিতেছেন বটে, কিন্তু রাজপুত্রের শোচনীয় দশা দেখিয়া তাঁহার সে গৌরব বিষাদময় হইয়া উঠিল। তাঁহারই পরিত্যক্ত পাদুকা কুমারের মস্তকে দেখিয়া দুঃখে তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল! তিনি মহারাণাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—দরিদ্রপালক! অধমের ত্যক্ত পাদুকা যুবরাজের মস্তকে দেখিয়া আমরা হৃদয়ে আঘাত পাইতেছি। সাধরীর সবিনয় নিবেদনে মহারাণা সস্নেহে কহিলেন,—সাধরীরাজ! দুর্ব্বিনীতা তনয়াকে শিক্ষা দিবার ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ আর কি আছে? আমি তোমায় যোগ্য পাত্র জানিয়া কন্যা দান করিয়াছি। মোগলবংশে কন্যা দান করিয়া যখন রাজবারার সমস্ত প্রধান ভূপালগণ যবনদোষে দূষিত হইয়াছেন, তখন তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পাত্র আর কে আছে? শৌর্য্য, বীর্য্য এবং আভিজাত্যে কোন্ ভূপতি তোমার সমতুল্য? তুমি পদমর্য্যাদায় হীন হইলেও আর সকল বিষয়েই তোমার সমকক্ষ দুর্ব্বিনীতা কন্যা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্বামী পাইয়াও স্বামীর সম্মাননা করিতে শিখিল না। তাই তাহাকে শিক্ষা দিবার জন্যই এই দরবারের আহ্বান।

মিবারের অযোগ্যা কন্যা দেখুক মিবারের ভাবী মহারাণা স্বীয় ভগ্নীপতির সম্মান-রক্ষায় কতদূর অগ্রসর। আমি অন্যান্য প্রহরীর ন্যায় কুমারের প্রতি তোমার পাদুকারক্ষার ভার প্রদান করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি সর্ব্বসমক্ষে উহা মস্তকে ধারণ করিয়া, হৃদয়ের উচ্চতা প্রকাশ করিয়াছেন, পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন; স্বীয় ভগ্নীর ভাবী মঙ্গল সাধন করিয়াছেন।

আজি তাঁহারই সাধু ব্যবহারে আমার সম্মান রক্ষা হইল। যাও, তোমার পত্নীকে লইয়া স্বীয় রাজ্যে যাও; আর সে স্বামীর আজ্ঞা পালন করিতে আপনাকে লঘু জ্ঞান করিবে না।

সামন্তরাজ অবনতমস্তকে রাণার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সভাগৃহ পরিত্যাগ করিলেন। দেখিলেন—উন্মাদিনী সরোজ-কুমারী চরণতলে বিলুণ্ঠিতা। এ,সে, গর্ব্বিতা, কঠোরা মিবাররাজনন্দিনী নহে। সরলা স্বামিপ্রেমভিখারিণী কোমলা সরোজ-কুমারী।

আনন্দে বিষাদ।

(স্বর্গীয় ৺উমেশচন্দ্র দত্ত পিতৃদেবের জন্মদিন উপলক্ষ্যে।)

১

সেই দিন—আহা! যেই শুভক্ষণে
তুমি এলে পিতঃ! এ ধরাতলে,
কোথা ছিনু মোরা জানেন বিধাতা,
আজি তা' নিরখি কল্পনা-বলে।

২

সেদিন আকাশে তরুণ তপন
আরো রাঙা হাসি ঢালিয়াছিল,
প্রদোষের কোলে সোণার চাঁদিমা,
আরো সুধা যেন মাখিয়া দিল।

৩

সেদিন প্রকৃতি পরিলা কুন্তলে
দিগন্ত-উজল কুসুমমালা,
স্বরগ-সমীর বহিল ভূতলে,
মন্দার সুবাস যাহাতে ঢালা!

৪

সেদিন বিহঙ্গ আরো মধু মেখে
গেয়েছিল গীতি তমালশিরে,
আরো পবিত্রতা উঠিল উথলি,
কলুষ-হারিণী-জাহ্নবী-নীরে।

৫

শান্তি অমরতা আপনা বিকা'তে
সাধিল নরের দুয়ারে পশি,
প্রসন্ন বিধির করুণাপ্রবাহ,
ত্রিদিব হইতে পড়িল খসি।

৬

দীন, দুঃখী, মূক, ব্যথিত পরাণে
আনন্দ আরাম সহসা পেলে,
বঙ্গজননীর বিশুষ্ক হৃদয়ে,
কেহ যেন দিল চন্দন ঢেলে।

৭

ভারত বামার বাম আঁখি-পাতা,
নাচিল, পুলকে পূরিল হিয়া,
ঘুমন্ত বালক হাসিল স্বপনে,
অমৃত উছলে অধর দিয়া!

৮

সেই শুভ দিনে মাতা বসুমতী
তোমারে প্রথম লভিলা বুকে,
অলক্ষ্যে দেবতা দিলা শুভাশীষ,
এ মর ধরণী ভরিলা সুখে।

৯

অদৃষ্টে "অমৃত" ষোড়শ মাতৃকা
শিশু-মুখে স্নেহে করিলা দান,
ভক্তি, প্রীতি, দয়া, কনক আসনে,
সে শিশু-হৃদয়ে লইলা স্থান।

১০

শুভ পৌষ মাস সিত নবমীতে,
পুণ্যবতী দেবী জননী তব,
কত জনমের সাধনার ফলে,
পাইলা তনয় "উমেশ" নব।

১১

—সেই ভোলানাথ মহেশ শঙ্কর,
—সেই আত্মজয়ী, গৃহস্থ-যোগী,
সেই ভূতপতি—অগতির গতি,
সেই অনাসক্ত অথচ ভোগী।

১২

আজি কোথা তুমি কোথা "কর্ম্মভূমি"
কোথা তব যত স্নেহের ধন,
কোথা আদরিণী সে "বামাবোধিনী"
কোথা তব প্রিয় সুহৃদগণ ?

১৩

কোন দেবদেশ আলোকিছ আজি,
আঁধারি তোমার সাধের গেহ—
তবু বুকে বুকে উঠিছে উছলি,
মন্দাকিনীধারা ও পূত স্নেহ।

১৪

যদিও যদিও জনমের মত,
এ দেশে তোমারে পাব না মরি।
তবুও পূজিব তবুও কাঁদিব,
তবুও ডাকিব পরাণ ভরি।

"পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ
পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে
প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

প্রণতা কন্যাগণ।

৺ নলিনীবালা।

Remember thee ?
Yes ! While there's life,
In this heart,
It shall never forget thee,
First flower of my heart !
And first gem of the sea !

2

Yes ! while there's life,
In this heart,
It shall never forget thee,
I might hail thee
With prouder, with happier brow
But could I love thee
More deeply ? Than now ?

কেন ? ওরে ক্ষণপ্রভা !
এ কাল নিশায়
চমকিয়া মিশে গেলি
আচম্বিতে হায়।
ভুলিবনা তোর আলো ওলো ক্ষণপ্রভা !
চিদাকাশে অমানিশা তবু হেরি আভা।



স্বর্গীয়া নলিনীবালা।

যত দিন শুভ্র ফুল ছিলে এ সংসারে,
সুধাধারা ঢালিয়াছ দীনে অকাতরে
পরসেবা করেছিলে, জীবনের সার,
তাহা স্মরি, পাইতেছি অশনিপ্রহার।
তোমার সে স্নিগ্ধ আভা, অতুল সুষমা,
নয়নসম্মুখে ভাসে, লো দেবী-প্রতিমা!

একমি প্রেস।

চমকিন্ সদা তুই এ আঁধা হিয়ায়।
আঁধারেতে আলো সম শ্মশান চিতায়।
ভুলিবনা চিত্র সেই সহসা উদিয়ে
চিরতরে লুকাইলি আঁধারে ডুবায়ে
এ চূর্ণ মানস এবে অন্ধকূপ হায়!
মা নলিনী! কোথা তুমি কেবা বলে দেয়।

ভগবানের কৃপাহিল্লোলে মানবাত্মার যখন পূর্ণ বিকাশ হয়, তখন তাহার সৌরভ ও সৌন্দর্য্য ধরাধামে অমরার সুষমা প্রদর্শন করিয়া মানবপ্রাণ বিমোহিত করে এবং পৃথিবীর নিম্ন ভূমি হইতে মানবের সঙ্কীর্ণ সংসারাসক্ত স্বার্থপর হৃদয়কে স্বর্গের পথে উত্তোলিত করিতে সমর্থ হয়। ভগবানের উদ্যানের এইরূপ পবিত্র কুসুমের রূপ ও গন্ধ কি পবিত্র ও মনোহর! আমার হৃদয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন প্রাণের নলিনী এই আদর্শ কুসুম (কলিকা) ছিল, এ কথা জননীর স্নেহাসক্তিসম্ভূত অত্যুক্তি নহে। এই কন্যা জন্মাবধি ব্রাহ্মসমাজের পবিত্র বক্ষে ও স্বর্গগত পুণ্যবান্ পিতার প্রভাবমধ্যে বর্দ্ধিতা হইয়া অল্পস্থায়ী জীবনেই যে আত্মার পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহা আমাদের অসংখ্য বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন তাহার সাক্ষ্য দিবেন। নলিনীবালা আমাদের পরিবারের প্রথম সন্তান বলিয়া জন্মগ্রহণাবধি আজীবন অতুল আদর ও যত্নে প্রতিপালিত হইয়াছিল। তাহার কার্য্য-ব্যস্ত পিতা তাহার লালন পালনের জন্য সুশিক্ষিতা দেশীয় ও বিদেশীয় ধাত্রী নিযুক্ত করিয়াও নিশ্চিন্ত থাকেন নাই, স্বয়ং শিশু-পালন সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠ এবং বিখ্যাত ডাক্তারগণের ব্যবস্থাগ্রহণ পূর্ব্বক তাহার শিশুজীবনের ব্যবস্থা স্থির করিতেন। নলিনী অতি ক্ষুদ্রকায়া হইলেও মনোহররূপ ও অঙ্গসৌষ্ঠব লইয়া জন্মিয়াছিল। সদ্যপ্রসূতা বালিকার সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করিয়া আমাদের ১১ নং সাউথ সার্কুলার রোডবাসী অসংখ্য বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। আমার সহোদর হইতেও স্নেহশীল ও শুভাকাঙ্ক্ষী স্বর্গগত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাহাকে দর্শন মাত্র স্ত্রীজাতির কত উচ্চ আদর্শ এ বালিকা জীবনে সম্পন্ন করিবে তাহা অনন্ত উৎসাহের সহিত বলিয়া আমার প্রাণ উচ্চ আশায় পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন। আমেরিকার দাসত্বপ্রথার উচ্ছেদ সাধন জন্য শ্রীমতী ষ্টৌই নাম্নী একটী মহিলা "Uncle Tom's Cabin" নামে এমন অপূর্ব্ব উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন যে, তাহা পাঠ করিয়া আমেরিকার অধিবাসী-গণের হৃদয়ে উন্মাদিনী শক্তি বিদ্যুৎপ্রবা-হের মত ছুটিয়াছিল। দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদ সাধন জন্য ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হওয়ার পর হতভাগ্য কাফ্রিগণের অবস্থার শুভ পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। গাঙ্গুলী মহাশয় নলিনীর প্রথম জন্মোৎসবে তাহার সুন্দর হাতে বাঁধান "Uncle Tom's Cabin" উপহার দেন। তাহাতে লিখিয়া দিয়া-ছিলেন—"This present is given to dearest Nolinee with a hope that she will be equal to Iva if not excel in goodness." জ্ঞান প্রাপ্ত হবামাত্র আমি নলিনীকে এই বহির গল্প]

মুখে মুখে বলিতাম এবং গাঙ্গুলী মহাশয় যে মহোচ্চ আদর্শে তাঁহার কোমল জীবন গঠিত দেখিতে ব্যাকুল, তাহার উল্লেখ বিশেষ ভাবে করিতাম। সরলা বালিকা চিত্রার্পিতের ন্যায় ইহার কাহিনী শ্রবণ করিত। আমাদের বিশেষ সৌভাগ্যক্রমে নলিনী ঠিক্ ইভার মত পরদুঃখকাতরতা, স্বার্থবিহীনতা ও সেবার স্বর্গীয় দৃষ্টান্ত পশ্চাতে রাখিয়া গত বৎসর ৯ই অক্টোবর অমরলোকে গমন করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

প্রমাণ-পঞ্জী।

(প্রাচীন ভারতের শিল্প-বাণিজ্য ও সমুদ্রযাত্রা বিষয়ক।)

প্রাচীন ভারতের গৌরবপূর্ণ ঐতিহাসিক সত্যের উদ্ধার করিতে হইলে বেদের প্রমাণ বা সাক্ষ্য সর্ব্বপ্রথম গ্রহণীয়। প্রতীচ্য-প্রদেশীয় সুধীগণ কর্ত্তৃক বেদ, মনুসংহিতা, অত্রিসংহিতা, বিষ্ণুসংহিতা, হারীতসংহিতা, রামায়ণ ও মহাভারতাদি গ্রন্থসমূহের কাল নিরূপণ বিষয়ে যে সকল মতামত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সঙ্গত ও ভ্রান্তি-শূন্য নহে। তাঁহাদের মুখের কথার (১) উপর নির্ভর করিলেও বেদ খৃষ্টদেবের প্রায় ১২০০ বৎসর পূর্ব্বে এবং মনুসংহিতা প্রায় ৯০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অন্যান্য কতিপয় প্রত্নবিদ্ পণ্ডিতগণের অনুমান যে খৃষ্টের আবির্ভাবের দুই সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল পূর্ব্বে বৈদিক সূত্রনিচয় গ্রথিত হইয়াছিল। আবার ঋগ্বেদই বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে সর্ব্বা-পেক্ষা প্রাচীন বা বয়োবৃদ্ধ। সেই অতিবৃদ্ধ অডিসী, ইলিয়ড, জেন্দ আবেস্তা, বাইবেল ও কোরাণ সরিফের আদি পুরুষ অভ্রান্ত আদিপুরুষবাক্য বেদের সাক্ষ্যই আমরা প্রথমে গ্রহণ করিব।

বেদের সাক্ষ্য।

৪৮ সুক্তের ৩য় মন্ত্রে প্রাচীন ভারতের ধনাকাঙ্ক্ষার সমুদ্রযাত্রার পরিচয় লইয়া আশ্বস্ত হওয়া যাউক ;—

(ক) "উষা যোধা উচ্ছাচ্চনু দেবী জীরায় যানাং।
যে অস্যা আচরণেষু দধ্রিবে সমুদ্রেণ শ্রবস্যবঃ॥"

ধনৈশ্বর্য্যদাত্রী উষার নিকট সম্পদ্-প্রার্থনা পুরঃসর সমুদ্রযাত্রা দ্বারা ধনলাভের কথায় বৈদিক ভারতবাসিগণের বাণিজ্যার্থে সমুদ্রযাত্রা বিষয়ক ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রমাণ আর কি হইতে পারে? "প্রাচীন-কালে উষা বাস করিতেন, অদ্যও প্রভাত করিতেছেন, ধনলুব্ধ ব্যক্তি যেরূপ সমুদ্রে নৌকা লইয়া যায়, উষার আগমনে যে বাসসমূহ সজ্জীকৃত হয়, উষা তাহা সেইরূপে

(১) স্যার উইলিয়ম জোন্সের অভিমত।

পাঠাইয়া দেন।” এখানে ধনলোভী ব্যক্তির সমুদ্রে নৌকা প্রেরণ কি জন্য বলিব? বাণিজ্যব্যপদেশে ধনলাভের আকাঙ্ক্ষাই সমুদ্রযাত্রার সম্ভাবিত ও বিশ্বাসযোগ্য কারণ।

৮৮ সূক্তের ৩য় মন্ত্রে সমুদ্রযাত্রার দ্বিতীয় পরিচয় গ্রহণ করা যাউক;—

(থ “আ যদ্রুহাব বরুণশ্চ নাবং প্রযৎ
সমুদ্রমীরয়াব মধ্যং।
অধি যদপাং স্নুভিশ্চরাব প্রপ্রেংখ ঈংখ
যাবহৈ শুভেকং॥”

“যখন বরুণের সহিত আমি জলযানে আরোহণ করিয়াছিলাম, সমুদ্রের মধ্যে সেই যান সুন্দররূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম, জলের উপর গমনশীল জলযানে অবস্থিতিকালে সেই আরামজনক নৌ-দোলায় আনন্দে ও স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া করিয়াছিলাম।” বৈদিক ভারতের নৌশিল্প ও সমুদ্রযাত্রার এই দুইটী প্রমাণে সন্তোষ লাভ না কর আরও কতিপয় প্রমাণ দর্শাইতে প্রস্তুত আছি।

যে ঋগ্বেদের বয়সের গাছ পাথর নাই, সেই ঋগ্বেদ এক স্থলে (২) সাগরবর্ণনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন—“বণিক্‌গণ লাভাকাঙ্ক্ষায় তরঙ্গসঙ্কুল ভীষণ সমুদ্রে আপনাপন অর্ণবপোত সকল ভাসাইতেছেন। অন্যত্র (৩) বলিতেছেন নরপতি তুগ্র কোন দ্বীপস্থিত শত্রুগণের উপর রুষ্ট ও বিরক্ত হইয়া তাহাদিগের বিরুদ্ধে রণ ঘোষণাপূর্ব্বক স্বীয় পুত্র ভুজ্যুকে বহুসংখ্যক সৈন্য সামন্তসহ এক সুবৃহৎ অর্ণবপোতযোগে প্রেরণ করিলেন। পথিমধ্যে রণযাত্রী রাজকুমারের রণবহর ভীষণ ঝটিকাক্রান্ত হইয়া জলমগ্ন হয়। সৌভাগ্যক্রমে রাজকুমার রক্ষা পান। এই রণপোতখানি শত দাঁড় যুক্ত ছিল। ইহা দ্বারা জানা যায়,—বৈদিক হিন্দুগণ নৌশিল্প ও সমুদ্রযাত্রা উভয় বিষয়ে বিলক্ষণ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিল। বৈদিককালের নৌশিল্প ও সমুদ্রযাত্রা বিষয়ক প্রমাণ পর্য্যাপ্ত নহে। নিম্নে ঋগ্বেদের ৪র্থ মণ্ডল হইতে আর একটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম;—

“মংদ্রা কৃণুধ্বং ধিয় আতনুধ্বং
নাব মরিত্র পবনীং কৃণুধ্বং।
ইষকৃণুধ্বমায়ুধারং কৃণুধ্বং
প্রাংচং যজ্ঞং প্রণয়তা সখায়ঃ॥” ২

গম্ভীর স্বরে স্তব কর; অরিত্র সহযোগে পরপারে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, এরূপ নৌকা প্রস্তুত কর, অস্ত্র সকল শাণিত ও শোভিত কর;—হে সখাগণ! উৎকৃষ্ট যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর।

বৈদিক যুগে দেবযানপথই বণিক্‌গণের বাণিজ্যার্থে গমনাগমনের সুগম ও প্রশস্ত পথ ছিল। উক্ত পথ সম্বন্ধে বৈদিক বণিক্ বলিতেছেন,—

“স্বর্গ ও ভারতের মধ্যবর্ত্তী যে সকল দেবযান পথ আছে, ঐ সকল পথ জল ও বরফশূন্য হউক, তাহা হইলে ঐ পথে

(২) ঋগ্বেদ,—১ম অষ্টক, ১০ম অনুবাক, ২১ বর্গ, ৮ শুক্ত।

(৩) ঋগ্বেদ,—১ম অষ্টক, ৭ম অনুবাক, ৮ বর্গ, ৫ শুক্ত।

যাতায়াতপূর্ব্বক পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া ধন লাভ করিতে পারিব।

আর এক স্থলে বলিতেছেন ;—

"ইন্দ্রমহং বণিজং চোদয়ানি,
স ন এতু পুর এতা নো অস্তু।
নুদন্নরাতিং পরিপন্থিনং মৃগং,
স ঈশানো ধনদা অস্তু মহ্যম্ ॥" ৪৪২পৃঃ

আমি দেবযানপথে ইন্দ্রের সমীপে পণ্য দ্রব্য অথবা সহযোগী বণিক্ প্রেরণ করিব। তিনি আমাদিগের হউন এবং পথিমধ্যস্থ দস্যুতস্কর প্রভৃতি শত্রু ও সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশু বিনাশপূর্ব্বক আমাদিগের অগ্রগামী নেতা হউন। তিনি প্রভাবসম্পন্ন ব্যক্তি, যাহাতে আমরা (ব্যবসায় দ্বারা) ধনলাভ করিতে পারি, তিনি তাহা করুন।" নাগবীথি পথ হইতে আদি দেবলোক পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেবযান-পথ যে বৈদিক যুগে আর্য্য হিন্দুগণের বাণিজ্য ব্যবসায়ের সুগম পন্থা ছিল, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহই থাকে না। কি জলপথে বাণিজ্যপোতাবলম্বনে, কি স্থলপথে রথ্যাশকটাদি আরোহণে বৈদিক হিন্দুগণ বাণিজ্য ব্যবসায়ে বিপুল ধনাগম করিতেন।

ঋগ্বেদে "শতা বিত্রাং নাবং"—শত পতত্র বা পতাকা বিশিষ্ট পোতের উল্লেখ কি তৎকালীন আর্য্যহিন্দুজাতির পোতনির্ম্মাণ ও সমুদ্রযাত্রাবিষয়ক অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতার সবিশেষ পরিচয় প্রদান করে না ?

ঋঃ সংহিতা ২৫ সূক্তের ৭ম মন্ত্রে বেদ "নাব সমুদ্রিয়" অর্থাৎ সমুদ্রগামী নৌকা বা পোতের উল্লেখে বৈদিক যুগে আর্য্য জাতির শিল্পকুশলতা ও বাণিজ্যার্থ সমুদ্র-পথে যাতায়াতের সুন্দর পরিচয় প্রদান করিতেছে।

"নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ ॥" (সাম-বেদী সন্ধ্যা প্রয়োগ) প্রভৃতি বৈদিক বচন দ্বারা তৎকালীন ভারতের নৌশিল্প ও সমুদ্রযাত্রার বিষয় নিশ্চিত প্রমাণ করা যাইতে পারে।

আমাদের দেশের অদ্বিতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিশারদ পণ্ডিত ৺ রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহাশয় "প্রাচীন ভারতের জলযান" (Ships and boats) শীর্ষক প্রস্তাবে লিখিয়াছেন ;—

"That in the time of the vedas and for sometime afterwards, the Hindus were familiar with ships adapted for sea voyages is a fact which is now no longer doubted. The frequent mention, in ancient Sanskrit literature, of pearls, which could not have been produced without the aid of boats that could brave the ocean wave, is of itself sufficient evidence on the subject. But others are not wanting. Allusions to the ocean and to ships are numerous even in the Sanhita of the Rig Veda."

বৈদিক যুগে বস্ত্র শিল্পের বিস্তৃত প্রচলন সম্বন্ধে কতিপয় প্রমাণ লইব। একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন,—"পৃথিবীর আদিম গ্রন্থ বেদের সূত্রনিচয় তৎকালীন

ভারতবাসীর বস্ত্রবয়ন শিল্পকার্য্যে পারদর্শিতার উত্তম নিদর্শন দিতেছে। সে সময়ে ভারতবাসী যে, সাধারণ ব্যবহার্য্য মাত্র বস্ত্রোৎপাদন করিয়া ক্ষান্ত ছিল তাহা নহে, পরন্তু তাহারা বিলাসের উপযোগী উৎকৃষ্ট বসন সকলও উৎপাদন করিত, তাহার বহুল প্রমাণ বিরল নহে।" তৎকালীন বয়নশিল্পের পরিচায়ক ঋগ্বেদের কয়েকটী সূক্তের ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—

"Enwrapping the extended world like a woman weaving a garment."—A Hymn to the Apris makes "night and day interweave, in concert, like two famous female weavers."—"The extended thread to complete the web of the sacrifice"—এবং "The fathers, who wove and placed the wrap and the woof."

(ক্রমশঃ)

গাছেদের বুদ্ধি।

১। সূচনা।

গাছেদের কি বুদ্ধি আছে? এ প্রশ্নের আমি ঠিক উত্তর দিতে পারি না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, জীবজন্তুদের যেরূপ বুদ্ধি আছে, ইহাদের সেরূপ বুদ্ধি নাই। কিন্তু অনেক সময় ইহাদের কাণ্ড-কারখানা নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

বনে নানা গাছ আছে। গায়ে গায়ে ঘেঁসাঘেসি হইয়া সেস্থানে তাহাদিগকে বাস করিতে হয়। বায়ু ও সূর্য্যকিরণ উদ্ভিদের নিতান্ত আবশ্যক। বায়ু ও সূর্য্যকিরণ না পাইলে উদ্ভিদ্‌শরীর সুস্থ অবস্থায় থাকে না। জীবজন্তু যেরূপ আহার করে, উদ্ভিদ্‌গিকেও সেইরূপ আহার করিয়া প্রাণরক্ষা করিতে হয়। উদ্ভিদের কতক আহার মাটীতে থাকে, কতক আহার বায়ুতে থাকে। ভূমিতে উদ্ভিদের যে আহার থাকে, তাহা তাহারা মূল দিয়া সংগ্রহ করে। উদ্ভিদের মূল কঠিন বস্তু আহার করিতে পারে না। জলের সহিত আহার দ্রবীভূত হইয়া তরল হইলে তবেই উদ্ভিদ্ তাহা শিকড়দ্বারা শোষণ করিতে পারে। সেজন্য ভূমিতে সর্ব্বদা রস থাকা আবশ্যক। জীব জন্তু যেরূপ নিশ্বাসের সহিত বায়ু গ্রহণ করে, ও প্রশ্বাস পরিত্যাগ করে, গাছেরাও সেইরূপ করে। এই উপলক্ষে আমি কতকগুলি বাজে কথা এ স্থানে বলিব। পাঠকগণ আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

মাছ যেরূপ জলের ভিতর ডুবিয়া থাকে, আমরাও সেইরূপ বায়ুর ভিতর ডুবিয়া আছি। এই বায়ু নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ

করিয়া জীব জীবিত থাকে। বায়ু না পাইলে জীব ক্ষণকালের মধ্যে মরিয়া যায়। যে বায়ু আমরা নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করি, তাহা একরূপ, আর যে বায়ু আমরা প্রশ্বাসের সহিত পরিত্যাগ করি, তাহা অন্যরূপ। যে বায়ু আমরা নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করি, তাহা বিশুদ্ধ। যে বায়ু আমরা প্রশ্বাসের সহিত পরিত্যাগ করি, তাহা দূষিত বিষময় বায়ু। ছোট একটী ঘরে দ্বার জানালা বন্ধ করিয়া যদি অনেক লোক বাস করে, তাহা হইলে সে ঘরের বিশুদ্ধ বায়ুটুকু সকলের নিশ্বাস গ্রহণে শীঘ্রই ফুরাইয়া যায়, এবং প্রশ্বাসের সহিত পরিত্যক্ত দূষিত বায়ুতে ঘরটী পরিপূর্ণ হইয়া পড়ে। এরূপ ঘরে অধিকক্ষণ থাকিলে মানুষ মারা পড়িতে পারে। মারা পড়ুক না পড়ুক, মানুষের শরীর অসুস্থ হয়।

পাঠিকাদিগকে শিক্ষা প্রদান করা আমার উদ্দেশ্য। সেজন্য গাছের কথা বলিতে বলিতে আমি অন্য কথা আনিয়া ফেলিলাম। আমি এ বিষময় বায়ুর কথা ও পরে বরফের কথা অনায়াসে ছাড়িয়া দিতে পারি, কিন্তু বলা আবশ্যক, সে জন্য বলিতে বাধ্য হইলাম।

সেদিন (পৌষ ১৩১৫) কলিকাতা চিনে-বাজারে একটী লোক ঘরের ভিতর শয়ন করিয়া রাত্রিকালে নিদ্রা যাইতেছিল। সকালবেলা তাহার শরীর অসুস্থ হইল। সমস্ত দিন তাহার গা বমি বমি করিতে লাগিল, মাঝে মাঝে চৈতন্যবিহীন হইবার উপক্রম হইল। যাহা হউক, ক্রমে তাহার শরীর সুস্থ হইল। পরদিন প্রাতঃ-কালে তাহার শরীর আরও অধিক অসুস্থ হইল। ফল কথা, সে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল। কোনরূপে সে হাঁসপাতালে গমন করিল। সে স্থানে তাহার অসুখের কারণ ধরা পড়িল। অতি কষ্টে তাহার প্রাণরক্ষা হইল।

তাহার অসুখের কারন কি? কেন সে অসুস্থ হইয়াছিল? আমরা প্রশ্বাসের সহিত যে বায়ু পরিত্যাগ করি, লোকটী নিশ্বাসের সহিত সেই বায়ু গ্রহণ করিয়া-ছিল। সেই জন্য তাহার শরীর অসুস্থ হইয়াছিল। কিন্তু সে ঘরে সে একলা শয়ন করিয়াছিল। এক জনের প্রশ্বাসে ঘর দূষিত বায়ুতে পরিপূর্ণ হয় না। তবে কোথা হইতে এত দূষিত বায়ু আসিল?

কথা এই যে, আমাদের প্রশ্বাসের সহিত যে দূষিত বায়ু বাহির হয়, কাঠ ও কয়লা পোড়াইলে অথবা কোন দ্রব্য পচিলে সেইরূপ দূষিত বায়ু উৎপন্ন হয়। কাঠ পোড়াইলে যত হউক না হউক, কয়লা পোড়াইলে এই ভয়ঙ্কর বাষ্প অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। আবার পাথুরে কয়লা অপেক্ষা কাঠের কয়লার বাষ্প অতি ভয়ানক। ফরাশি দেশে লোকে এই উপায়ে আত্মহত্যা করে। ঘরে কাঠের কয়লা জ্বালাইয়া, দ্বার জানালা বন্ধ করিয়া, আত্মঘাতী শয়ন করে। কয়লার ধূমে শীঘ্রই সে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। ইহ-জীবনে আর কখন তাহার চৈতন্য হয় না।

আশ্চর্য্য কথা এই যে, লোক জানিতেও পারে না যে, তাহার প্রাণবিয়োগ হইল।

আমি নিতান্ত মূর্খ নই। কিন্তু একবার আমি নিজে এই বিপদে পড়িয়াছিলাম। একবার শীতকালে আমার জ্বর হইয়াছিল। শীত আর কিছুতেই ভাঙ্গে না। একখানি বড় কড়াতে আমি গুল জ্বালাইলাম। গুলের বাষ্প যে কি ভয়ানক তাহা আমি জানিতাম। সে জন্য গুল ঘরের বাহিরে জ্বালাইলাম। তাহার ধূম বাহির হইয়া গেল। তাহার পর গুলের আগুন রক্তবর্ণ হইয়া গন্ গন্ করিতে লাগিল। আমি মনে করিলাম যে, এখন কড়াখানি ঘরের ভিতর লইয়া গেলে আর কোন ভয় নাই। আগুন ঘরের ভিতর লইয়া যাইলাম। শীতকাল। কাজেই দ্বার জনালা বন্ধ করিয়া শয়ন করিলাম। খানিক রাত্রিতে সহসা আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। জাগরিত হইয়া দেখি যেন আমার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইতেছে। উঠিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু উঠিতে পারিলাম না। উঠিতে যাই, আর মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাই। ঘরে আর একজন ছিল। তাহাকে জাগরিত করিলাম। সেও উঠিতে পারে না। সেও উঠিতে যায় আর মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যায়। যাহা হউক অতি কষ্টে আমরা ঘরের দ্বার খুলিয়া ফেলিলাম। তখন বাহির হইতে বিশুদ্ধ বায়ু আসিয়া ঘরের দূষিত বায়ুকে অনেক পরিমাণে দূরীভূত করিল। তাহাতেই আমাদের প্রাণ বাঁচিয়া গেল। আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তাই আমাদের প্রাণরক্ষা হইল। কিন্তু সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটে না। কয়লার বাষ্পে লোকের শরীর বিষাক্ত হইলে প্রায় লোকের নিদ্রাভঙ্গ হয় না। প্রায় লোক জানিতে পারে না যে সে মরিয়া গেল।

তবেই দেখ, বাহির হইতে গুল কি কয়লা ভালরূপে ধরাইয়া তাহার পর ঘরের ভিতর আনিলেও রক্ষা নাই। ঘরের ভিতর গোড়া হইতে কাঁচা গুল কি কয়লার আগুন করিলে যে বিষম বিপদ ঘটে সে কথা আর বলা বাহুল্য। কলিকাতায় আতুঁড় ঘরে এখন অনেকে গুলের আগুন রাখে। তাহাতে অনেক শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু কি জন্য মরিল, লোকে তাহা জানে না। বাড়ীর লোকে মনে করে যে, কোনরূপ আতুঁড়ে রোগে শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

কয়লার আগুনে সর্ব্বদাই লোকের বিপদ ঘটে। আর দুইটী ঘটনার কথা এ স্থানে আমি বলিব। একবার হিমালয় পর্ব্বতে আমি বাস করিতেছিলাম। একজন বড় সাহেব ভল্লুক শিকার করিতে বাহির হইয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে চৌদ্দ জন কুলি ছিল। কুলিদের জন্য সাহেব ছোট একটী তাঁবু দিয়াছিলেন। রাত্রিতে কুলিরা তাঁবুর ভিতর শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইত। শীতকাল। হিমালয়পর্ব্বতের শীত। গরম জলে আমি স্নান করিতাম, আর সে জল এক হাত গড়াইয়া যাইতে না যাইতে জমিয়া বরফ হইয়া যাইত। সন্ধ্যাবেলা কুলিরা দুই ঝুড়ি কাঠের কয়লা পাইয়া-

ছিল। তাঁবুর ভিতর ঠিক মধ্যস্থলে তাহারা একটী গর্ত্ত করিল। সেই গর্ত্তের ভিতর আগুন করিয়া তাহার উপর সেই দুই ঝুড়ি কয়লা তাহারা ঢালিয়া দিল। কয়লা গন্ গন্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। আগুনের দিকে মাথা করিয়া চতুর্দ্দিকে গোল হইয়া কুলিরা শয়ন করিল। রাত্রিতে অনবরত আকাশ হইতে বরফ পড়িল। আকাশ হইতে যে বরফ পড়ে তাহা শিলের মত নহে, খুব সাদা তুলার মত। নিঃশব্দে পড়িতে থাকে। প্রাতঃকালে সকলে দেখিল যে, সমুদয় পৃথিবী সাদা হইয়া গিয়াছে। যে দিকে চাহিয়া দেখিবে, কেবল সাদা—সাদা ধপ্ ধপ্ করিতেছে। ভূমি সাদা, পথ ঘাট সাদা, ঘর সাদা, গাছ সাদা, এমন কি কাকগুলি পর্য্যন্ত সাদা। এমন উজ্জ্বল সাদা যে, বরফের উপর অধিক-ক্ষণ চাহিয়া দেখিলে চক্ষু ঝলসিয়া যায়। সকালে উঠিয়া সকলে এইরূপ ধৌত-বসনা বিচিত্রবরণা পৃথিবীকে দর্শন করিল।

কাকের গায়ে ক্রমাগত বরফ পড়িয়া ভারি হইলে, পাখা নাড়িয়া কাক তাহা ঝাড়িয়া ফেলে। গাছের উপর অনেক বরফ জমা হইলে, ডাল ভাঙ্গিয়া পড়ে। ঘরের ছাদের উপর অনেক বরফ জমা হইলে, তাহা দূর করিয়া ফেলিতে হয়। তাহা না করিলে ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়ে। মাটিতে পড়িবার পর, বরফ আর পূর্ব্বরূপ তুলার ন্যায় কোমল থাকে না, তখন পরিষ্কার বিলাতি লবণের ন্যায় কঠিন হয়। তাহার উপর দিয়া মানুষের গতায়াতে বরফ আরও কঠিন হইয়া কাচের ন্যায় মসৃণ ও পিচ্ছিল হইয়া পড়ে। এইরূপ বরফের উপর চলিতে চলিতে আমি যে কত আছাড় খাইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। লূনের ন্যায় ভুরায় লইয়া ছেলেরা খেলা করে। পাঁচ ছয় মুষ্টি বরফ লইয়া অনায়াসে গোলাকার বর্ত্তুল করিতে পারা যায়। বরফের ভাঁটা তাহারা লোকের গায়ে ছুড়িয়া মারে। তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না। বরফের গোলা মানুষের গায়ে লাগিয়া তৎক্ষণাৎ গুঁড়া হইয়া যায়। সুতরাং কোন রূপ অনিষ্ট হয় না। গোলা নিক্ষেপ করিয়া ছেলেরা হাসিয়া উঠে। যাহাকে তাহারা মারিল, সেও হাসিয়া উঠে। এরূপ একটী বরফের গোলা মাটিতে ফেলিয়া তাহাকে পা দিয়া আমি গড়াইয়া লইয়া যাইতাম। ঘরের বাহিরে এক রত্তি ভূমিও বরফ শূন্য নাই। সুতরাং গোলাটী বরফের উপর দিয়া আমি গড়াইয়া লইয়া যাইতাম। গোলাটার চতুর্দ্দিকে আরও বরফ লাগিয়া যাইত। যাইতে যাইতে তিলটী ক্রমে তালের মত হইত, তাহার পর তালটী হাঁড়ির মত হইত, তাহার পর সেই হাঁড়িটী বৃহৎ একটী জালার মত হইত। অবশেষে যখন বিপর্য্যয় এক বরফের গোলা হইত, তখন আর তাহাকে নাড়িবার আমার শক্তি হইত না।

কোন কোন দেশে পৃথিবীর উপর কুড়ি হাত উচ্চ হইয়া বরফ জমা হয়। সেই গভীর বরফ জমা বাঁধিয়া যায়। তাহার ভিতর গহ্বর করিয়া সেই গহ্বরের

ভিতর শীতকালে লোকে বাস করে। আমেরিকা মহাদেশে এক স্থানে পনর হাজার হাত উচ্চ পর্ব্বতের উপর দিয়া রেল গিয়াছে। সেই রেলপথে শীতকালে সর্ব্বদা দশ হাত বার হাত, পনর হাত গভীর হইয়া বরফ জমা হয়। কাজেই তখন গাড়ির চলাচল বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু অধিক দিন বন্ধ থাকে না। রেল-পথ হইতে তুষাররাশি দূর করিবার নিমিত্ত আমেরিকাবাসীরা এক কল করিয়াছে। দশ সহস্র অশ্ববলে সেই কল বরফের সহিত যুদ্ধ করে। দিনের পর দিন তুমুল যুদ্ধ করিয়া তবে কল বরফকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়। এই পর্ব্বতের মাথার কয়েক স্থানে অনেকগুলি রেলের কর্ম্মচারী ও কুলি মজুর বাস করে, সুতরাং দোকানি পসারিও সে স্থানে আসিয়া জুটিয়াছে; সুতরাং সে স্থানগুলি ছোট ছোট নগরে পরিণত হইয়াছে এবং লোকজনের যাতায়াতের নিমিত্ত সে স্থানে পথ ঘাটও হইয়াছে। অনেক টাকা খরচ করিয়া, বিপর্য্যয় আসুরিক বল প্রয়োগ দ্বারা রেলপথ হইতে বরফ দূরীভূত করিতে হয়। কিন্তু এত টাকা খরচ করিয়া পথ ঘাট হইতে কে আর বরফ দূর করে? সমস্ত শীতকাল পথে দশ পনর হাত গভীর বরফ জমা হইয়া থাকে। এ বাড়ী সে বাড়ী বেড়াইতে না গেলে চলে, কিন্তু দোকানে না গেলে লোকের চলে না। সে জন্য বরফের ভিতর সুড়ঙ্গ করিয়া লোক গমনাগমন করে।

জার্ম্মানি দেশের রাজধানী বার্লিন নগরে একবার আমি বরফে আটক পড়িয়াছিলাম। পৌষ মাস, ইংলণ্ডে বরফ পড়িয়াছিল, কিন্তু খুব অধিক নহে। সমুদ্র পার হইয়া আমি হলাণ্ড দেশে উপস্থিত হইলাম। সে স্থানে আসিয়া দেখিলাম যে দেশ বরফে আচ্ছাদিত হইয়াছে। কিন্তু খুব গভীর ভাবে নহে। বেলজিয়ম ও ফরাশি দেশও সেইরূপ। তার পর যখন বার্লিনে আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন রাত্রি দিন বরফ পড়িয়া সমুদয় দেশ সাত আট হাত গভীর বরফে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল। তার ছিঁড়িয়া গেল, রেলগাড়ি বন্ধ হইয়া গেল। যখন পুনরায় রেলপথ পরিষ্কৃত হইল, তখন আমি বার্লিন হইতে বাহির হইতে পারিলাম। জার্ম্মাণি পার হইয়া অষ্ট্রিয়া দেশে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম যে, সমুদয় দেশ অতি গভীর ভাবে তুষারে আবৃত হইয়া আছে। যে দিকে চাহিয়া দেখি, সেই দিকেই বরফ, বরফ ব্যতীত আর কিছুই নাই। তাহার পর, আল্‌প্‌স্ পর্ব্বতের তো কথাই নাই। আল্‌প্‌স্ পর্ব্বত পার হইয়া যখন ইতালি দেশে রোম নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন আমি বরফের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলাম। এক্ষণে পুনরায় আবার সেই কুলিদের কথা আরম্ভ করি।

হিমালয় পর্ব্বতের উপর সাহেব শীত-কালে ভল্লুক শিকার করিতে গিয়াছিলেন। চৌদ্দ জন কুলি একটী তাঁবুর ভিতর শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছিল। তাঁবুর মাঝখানে

গর্ত্ত করিয়া, সেই গর্ত্তে কয়লার আগুন করিয়া, সেই আগুনকে ঘিরিয়া কুলিরা শয়ন করিয়াছিল। প্রাতঃকালে উঠিয়া সকলে দেখিল যে, দেশ বরফে আচ্ছাদিত হইয়াছে। আরও সকলে দেখিল যে, তাঁবুর কাপড় ও ভূমি এই দুইয়ের মাঝখানে যে অল্প ফাঁক থাকে বরফে সে ফাঁক বুজিয়া গিয়াছে।

আজ এই পর্য্যন্ত থাকুক। এবার কেবল আমি প্রবন্ধের সূচনা করিয়া রাখিলাম। পরে অন্যান্য কথা বলিব।

শ্রীত্রৈলোক্য নাথ মুখোপাধ্যায়।

ব্রত রহস্য।*

কর্ত্তব্যবোধে শাস্ত্রপ্রচলিত কতকগুলি ব্রত নিয়ম গ্রহণ করিলাম। ভগবদ্গীতার উপাসিকা আমি,—আবাল্য নিষ্কাম কার্য্য অভ্যাস করিবার শিক্ষা পাইতেছি, সকাম ব্রতাদি কার্য্যে আমার তেমন আস্থা ছিল না। এবং উহাদ্বারা কেবল কামনাবৃদ্ধি ব্যতীত আর কিছু যে উপকার পাওয়া যায়, তাহা তখন বিশ্বাস করিতাম না। কিন্তু তথাপি লৌকিক আচারের বশবর্ত্তিনী হইয়া কেবল ব্রত গ্রহণ করিলাম। মনে আবার সন্দেহ হইতে লাগিল, কামনামূলক ব্রতপূজাদি যে শাস্ত্র হইতে প্রচলিত, ভগবান্ নিষ্কামধর্ম্মের উপদেষ্টা হইয়া সকাম শাস্ত্রবিধি মানিয়া চলিতে আদেশ করিলেন কেন? অবশ্যই ইহার কিছু গূঢ় অর্থ আছে। নহিলে শাস্ত্রও মিথ্যা হইতে পারে না, ভগবদ্বাক্যও মিথ্যা হইবার নহে। ইহার মধ্যে এমন রহস্য আছে যাহা সকাম ও সাকার উপাসনাকারী শাস্ত্র এবং নিষ্কাম ও নিরাকার উপাসনার উপদেশক গীতার সহিত একমত হইয়া মিলিয়া যায়। কিন্তু তাহা জানিব কিরূপে?

বাসনা কখনই বিফল হয় না, ইহা ধ্রুব সত্য। মানুষ কায়মনোবাক্যে যাহা প্রার্থনা করে, শীঘ্রই হউক, অথবা বিলম্বেই হউক, সে বাসনা তাহার পূর্ণ হইবেই হইবে। এইরূপে আমার অনেকগুলি বাসনা পূর্ণ হইয়াছিল বলিয়া আশা ও উৎসাহ বাড়িয়াছিল। তাই আবার ব্রতরহস্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু কে আমার মনের সন্দেহ দূর করিবে? অন্তঃপুরাবদ্ধা রমণী আমি,—পণ্ডিতসমাজে গিয়া যে এ বিষয়ে মীমাংসা করিয়া আসিব, তাহার উপায় নাই। শিক্ষিতা ভগিনীগণের সহিত এ বিষয়ের তর্ক করিলেও যে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিয়া জিতিতে পারিব, আমার সে আশা এবং ক্ষমতাও নাই। কোনও ধর্ম্মমূলক সভা সমিতিতে উপস্থিত থাকিয়া বক্তাগণের উপদেশেও যে আমার মনের সংশয় নিবারিত করিব, হিন্দুকুলকন্যা

* লেখিকার 'সাধনার সিদ্ধি' নামক অপ্রকাশিত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

আমি—সে সুযোগেও বঞ্চিতা। তবে কিরূপে এ রহস্যের মর্ম্মভেদ করিব? আবার আমার এত বিদ্যা শক্তিও নাই, যাহার ফলে সমস্ত শাস্ত্র অনুশীলনপূর্ব্বক গীতার সহিত মিলাইয়া লইতে পারি। কিন্তু এত প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও মন কিছুতেই মানিতে চাহে না যে গীতা আর শাস্ত্র বিভিন্ন, কারণ তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্মের মূল উৎপাটিত হইয়া যায়, সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র মিথ্যা বলিয়া মনে হয়, অথবা শাস্ত্র মানিলে গীতাকেই মিথ্যা বলিতে হয়। সে যে বড় বিষম ব্যাপার, ক্ষুদ্রবুদ্ধি রমণী আমি,—শাস্ত্র বিষয়ে বাদানুবাদ ও ধর্ম্ম লইয়া তুমুল আন্দোলন করিলে সেই তর্ক বিতর্কের প্রবল ঝটিকায়—বহুক্লেশে আমি যে বিশ্বাস ও ভক্তি-চারাটুকু এত দিনের তপস্যায় হৃদয়কাননে রোপণ করিয়াছি, তাহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে। সেই ভয়ে সে কথা আর কাহাকেও ভালরূপে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইত না।

তখন মনে হইল যিনি আমার সকল সংশয়নিবারিণী, যিনি ধর্ম্মপথে আমার একমাত্র উপদেষ্টা, সেই ইষ্টদেবতার শরণাপন্ন হই, তিনি ভিন্ন আর ত কেহ আমার শিক্ষক উপদেশক নাই। তাই তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছিলাম, সকল বিদ্যার শিক্ষয়িত্রী সেই জগজ্জননীর কৃপায়, এবং শাস্ত্রদ্রষ্টা মহাপুরুষগণের উপদেশে অবশেষে আমার সে সংশয় দূর হইয়াছে।

শাস্ত্রে আছে, দীর্ঘকালানুপালনীয়-সংকল্পো ব্রতমিতি। স্বকর্ত্তব্যবিষয়ে নিয়তঃ সঙ্কল্পো ব্রতমিতি। দীর্ঘকাল পালনীয় সংকল্পের নাম ব্রত। স্ব কর্ত্তব্য বিষয়ে নিয়ত সঙ্কল্পের নাম ব্রত। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

ব্রতেন দীক্ষামাপ্নোতি দীক্ষয়াপ্নোতি
দক্ষিণাম্।
দক্ষিণা শ্রদ্ধামাপ্নোতি শ্রদ্ধয়া সত্যমাপ্যতে॥

অর্থাৎ ব্রতের দ্বারা দীক্ষা—ব্রহ্মবিদ্যা লাভের সাধন সম্পত্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। দীক্ষার দ্বারা দক্ষিণা,—অর্থে কৃত সাধনাদির ফলপ্রাপ্তি হয়। দক্ষিণা হইতে শ্রদ্ধার উৎপত্তি,—এবং শ্রদ্ধার দ্বারাই সত্য বা পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রদ্ধা ব্যতীত নির্ম্মল জ্ঞানের উদয় হয় না, ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা লাভের জন্য ব্রত ধারণের প্রয়োজন। নিয়ম এই ব্রতের নামান্তর। আমরা দেখিতে পাই, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ ব্যাপারই নিয়মের অধীন, যে পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চভূত হইতে বিশ্ব পদার্থের সৃষ্টি ও পালন হইতেছে, যথাকালে সেই নিয়মানুসারেই পদার্থের বিনাশ ঘটিয়া বিলীন হইয়া যাইতেছে। জড়জগৎ হইতে জীবজগতের সমস্ত প্রকৃতিই নিয়মের অধীন। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র হইতে জল, স্থল, অনিল, অনল প্রভৃতি সমস্ত পদার্থই নিয়মের বশীভূত থাকিয়া আপনাপন কার্য্য করিতেছে। পৃথিবীর সকল বস্তুতেই প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী জন্ম, মৃত্যু, হ্রাস, বৃদ্ধি, স্থিতি ও বিনাশ সাধিত হইতেছে, কেহ তাহার ব্যতিক্রম ঘটাইতে পারে না। দেখিয়া মনে হয়, এই নিয়ম

ও শৃঙ্খলার সহিত বিশ্বরাজ্য পালন করা যেন মহামহিমাময় বিশ্বস্রষ্টার ব্রত বা সংকল্প। আবার সংসারেও দেখিতে পাই, সংসারের যাহা কিছু প্রার্থনীয় ভোগ্য বস্তু, সুখ, সমৃদ্ধি হইতে সিদ্ধি মোক্ষ প্রভৃতি সমস্তই নিয়মবানের প্রাপ্য। অনিয়মিত ব্যক্তির বিঘ্ন বিপদ পদে পদে ঘটে। সেই জন্য আমাদের শাস্ত্রে মানবের সাংসারিক ও পারমার্থিক যাবতীয় কার্য্য নিয়মবদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু শাস্ত্রকথিত নিয়ম আমরা কয়জন শ্রদ্ধার সহিত পালন করি? পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, দৃঢ়ব্রতের পক্ষে ত্রিভুবনে কিছুই অপ্রাপ্য নাই, দৃঢ়সংকল্প না হইলে কোন কার্য্যেরই সাফল্য লাভ করা যায় না।

বস্তুতঃ পশু, পক্ষী, তরু লতা, কীট পতঙ্গাদি সমস্ত জীব জগতে আহার বিহার প্রভৃতি শরীরধারণ উপযোগী তাবৎ কার্য্যই প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী করিয়া থাকে, কেবল যথেচ্ছাচারী অসংযতেন্দ্রিয় মনুষ্য এই নিয়মপালনে অশক্ত হইয়া নানাবিধ রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্যে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে। প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিলে তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য। বিজ্ঞ, বিচক্ষণ চিকিৎসকেরাও কহিয়া থাকেন, মানুষ যদি সুনিয়মে শরীর রক্ষা করিতে পারে, প্রকৃতির নিয়মানুসারে শরীরকে পরিচালিত করে, তবে কখনও তাহাকে রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

শাস্ত্রে পাঠ করিয়াছি, মনুষ্যশরীর যেমন প্রকৃতির নিয়মের অধীন, সেইরূপ মনো-রাজ্যের অধ্যাত্ম নিয়ম সমূহও মানুষকে নিয়ত বশীভূত রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। মানুষ কেবল কাম ক্রোধাদি আসুর ভাবের বশীভূত হইয়া পরিচালিত হয় না, দয়া, ধর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক প্রভৃতি দেবভাবও মনুষ্যহৃদয়ে বিদ্যমান আছে। মানবের মনোরাজ্যে প্রতিনিয়তই এই দেবাসুরের সংগ্রাম চলিতেছে। ক্রোধে উত্তেজিত উন্মত্ত হইয়া, যে মানুষ অপকারী বা শত্রুকে হত্যা করিয়াও প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করে, সময়বিশেষে সেই মানুষই আবার শত্রুর জীবন রক্ষা করিয়া প্রাণের দয়া ও করুণা বৃত্তিকে সার্থক করিয়া থাকে। সচরাচর আমরাও আজ যাহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তিরস্কার করিলাম, কাল আবার তাহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে পুরস্কৃত করিতেছি। শত্রুবৎ বোধে বিরক্ত হইয়া আজ যাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতেছি, কাল হয়ত আবার তাহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহার সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য লালায়িত হইতেছি। মোহের বশীভূত হইয়া আজি যে সংসার-সুখকে অমৃতবৎ মনে করিতেছি, ক্ষণমাত্র বিবেকের উদয়ে তাহাই আবার বিষের মত পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইতেছে। বস্তুতঃ মনুষ্য কোন একটী ভাবে মন স্থির করিয়া রাখিতে পারে না। তাই মানবের ব্রতধারণের আবশ্যক, ব্রতধারণ না করিলে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব বিকশিত হয় না। মনোরাজ্যে আসুর ভাবকে পরাজয় করিয়া দেবভাবকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই ব্রতের প্রয়োজন।

হিন্দুশাস্ত্রে যে সকল ব্রতের বিধি আছে, ব্রহ্মচর্য্য—শৌচ, সত্য, ক্ষমা, দয়া, দান, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সন্তোষ ও দেবপূজা—সেই সকল ব্রতের প্রধান অঙ্গ। সকল কার্য্যে নিষ্ঠা ও ব্রত ধারণপূর্ব্বক দেবভাব লাভ করিয়া মানবজন্ম সফল করাই হিন্দুশাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রবৃত্তি-মার্গের সমুদয় ব্যাপারকে হিন্দুগণ সংযমের পথে নিয়মিত করিয়া দেবভাব উপার্জ্জন করেন, তাহারই নাম ব্রত।

শিল্প, বিজ্ঞান, কল, কৌশল প্রভৃতি আজকাল যেমন কেবল প্রবৃত্তিমার্গের বাসনাকে পরিতৃপ্ত করিতেছে, অনন্ত ভোগকাল হইতে আর্য্য ঋষিগণের সমস্ত চেষ্টা সেইরূপ নিবৃত্তি-মার্গের ত্যাগ ও মুক্তি অন্বেষণ করিয়াছে। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যে দিব্য সম্পদের কথা বলিয়াছেন, মানুষ দেবপূজা ব্যতীত ইচ্ছা করিলেই কি সেই দৈবসম্পদ্ প্রাপ্ত হইতে পারে? তাই দেবপূজা ও দেবপ্রসাদের প্রয়োজন; এই জন্য দেবতাকে আবাহন করিয়া সকল ব্রতেরই সঙ্কল্প করিতে হয়। দৈববল প্রাপ্ত না হইলে আমাদের মত মোহান্ধ দুর্ব্বলচিত্ত লোকে সহজে কি দুর্দ্দম মন ও প্রবৃত্তিকে বশীভূত করিতে পারে? সেই জন্যই এখনকার ব্রত সংকল্পহীন, শাস্ত্র বিশ্বাসহীন, হিন্দুসমাজে যথেচ্ছাচারের প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইয়া সমাজকে এমন অলস ও অধঃপাতিত করিতেছে।

অধুনা আমরা যে সকল ব্রতকার্য্য পালন করিয়া থাকি, তাহা কেবল অহঙ্কারের বশে। শাস্ত্রানুসারে ব্রতের উপকরণাদির অনুষ্ঠান করি বটে, কিন্তু যে উদ্দেশে ব্রত, নিয়ম, যাগ যজ্ঞাদি প্রচলিত হইয়াছে, সেই দেবপ্রসাদ আমরা লাভ করিতে পারি না। কারণ আমাদের মন কেবল বাহ্য আড়ম্বর লইয়াই ব্যস্ত থাকে, অন্তরের মধ্যে একবারও দৃষ্টিপাত করে না, যে ব্রতজনিত উপবাস ও দেবপূজা আমাদিগকে পবিত্র করিল কি না, চিত্তশুদ্ধি হইল কি না, ইন্দ্রিয়সকল সংযত হইয়া আমাদিগকে সন্তোষ দান করিতেছে কিনা। কিন্তু আমরা দেখি কেবল, কিরূপ আড়ম্বরের সহিত ব্রত করিলে লোকে ধন্য ধন্য করিবে, কি অনুষ্ঠানের ত্রুটি ঘটিলে লোকে নিন্দা করিবে।

দেবতা পূজাগ্রহণে প্রীত হইলেন কি না, দেখিবার পূর্ব্বে আমরা দেখি, লোকে আমার ব্রতের কথা জানিল কি না, ইত্যাদি চিন্তা আমাদিগকে কেবল গর্ব্বিত করে মাত্র। এখন আমরা লৌকিকতা ও যশের জন্য ধর্ম্মকার্য্য করিয়া থাকি, তাই ধর্ম্মকার্য্যের ফলও তদনুরূপ প্রাপ্ত হই। ইহাতে আমাদের অন্তরস্থ দেবভাবের বৃদ্ধি না হইয়া আমাদিগকে অধিকতর আসুরভাবাপন্ন করিয়া তুলে। সেই জন্যই ধর্ম্মকার্য্যের ফল সচরাচর দৃষ্ট হয় না বলিয়া আমরাই আবার শাস্ত্র মিথ্যা, যাগ যজ্ঞ ব্রত পূজাদি সব মিথ্যা মনে করিয়া অশ্রদ্ধায় ত্যাগ করিতেছি। প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিয়া, ঐ সকল পুণ্যকার্য্য করিলে, এখনও নিঃসন্দেহে তাহার পুণ্যফল আমরা প্রাপ্ত

হইতে পারি। গীতায় দেখিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মযোগ বা নিষ্কাম কার্য্যকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। কর্ম্মই ব্রহ্ম, যে কর্ম্ম দ্বারা জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত মিলিত হন, তাহাই কর্ম্মযোগ। আর যে কর্ম্ম জীবকে পরমাত্মার সহিত বিচ্ছিন্ন করে, তাহা অকর্ম্ম। সংসারে বিষয়াসক্ত হইয়া অহঙ্কারের বশে আমরা যে সকল কার্য্য করিয়া থাকি, তাহা সমুদয়ই অকর্ম্ম, কারণ ইহাতে পরমাত্মা হইতে আমরা নিজেকে পৃথক্ ভাবে ভিন্ন করিয়া লই। মানব যতদিন ইন্দ্রিয় ও রিপুগণের বশীভূত থাকে, যতদিন তাহার বিষয়ে আসক্তি ও ভোগবাসনা পরিতৃপ্ত না হয়, ততদিন সকাম কার্য্যে সাকার দেব দেবীর পূজা বা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করা মানুষের পক্ষে প্রশস্ত বিধি। দেবদেবীর পূজার দ্বারা মানুষ যখন ক্রমে চিত্তশুদ্ধি ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে থাকে, যখন সংসারে প্রকৃত বৈরাগ্য ও বিরক্তির উদয় হয়, মনের সকল পাপবৃত্তি ক্ষয় পাইয়া, প্রকৃত জ্ঞানের ও ভক্তির সঞ্চার হয়, তখন মানবাত্মা আপনা হইতেই নিষ্কাম কার্য্যের দ্বারা, নিরাকার উপসনায় নির্গুণ ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়। ইহাই শাস্ত্রোক্ত সকল ধর্ম্ম কার্য্যের চরম লক্ষ্য। সমস্ত দেব দেবীর পূজা প্রকারান্তরে সেই পরমাত্মাতেই সমর্পিত হয় কেননা তাহাই পরম ব্রহ্মের সগুণ ও সাকার রূপ। শাস্ত্র সেই জন্যই সমস্ত দেবলোক, পিতৃলোক, ভূতলোকের পূজার্চ্চনার মধ্যে সেই পরমাত্মার পূজাই নির্দ্দেশিত করিয়াছেন। অবশ্য অন্য সর্ব্বপ্রকার পূজার্চ্চনা হইতে প্রত্যক্ষ ভাবে পরব্রহ্মের উপাসনা করাই শ্রেষ্ঠতম কর্ম্ম, এবং তাহা ব্যতীত মোক্ষ হয় না। কিন্তু আমাদের মত মায়ামোহিত সাধারন ব্যক্তি, শাস্ত্রোক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান ব্যতীত কিছুতেই একেবারে ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ করিবার অধিকারী হয় না। ব্রত, পূজা, যাগ যজ্ঞাদির দ্বারা, সেই পরমাত্মাই আমাদিগকে সংযম ও পবিত্রতা দান করিয়া, তাঁহার সমীপস্থ হইবার উপযুক্ত করিয়া লন। অন্যথা তাঁহার নিরাকার রূপ সহজে আমরা ধারণা করিতে সমর্থ নহি।

সাধনারচয়িত্রী।

দাগীচোর।

১

সকলেই বলিল, "দেশে থেকে খোকা কিছুতে আরাম হবে না,—উহাকে নিয়া কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে যাও।" কথাটা মনে লাগে বটে, কিন্তু টাকা কই? উনি সামান্য যাহা উপার্জ্জন করেন, তাহা গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্ব্বাহের, পক্ষেও প্রচুর নহে,—তার উপর আজ এক বৎসর যাবৎ খোকার জ্বর, যকৃৎ ও প্লীহা এই তিনটী কঠিন রোগের তাড়নে যায় যায়!

কত কবিরাজ, কত ডাক্তার এবং কত অবধূতকে যে দেখাইয়াছি, তাহার সংখ্যা হয় না। কেহ কেহ কিছু নিয়াছেন, কিন্তু অনেকেই আমাদের দারিদ্র্য জানিয়া, কিছুই গ্রহণ করেন নাই। এমন কি কেহ কেহ কৃপাপরবশ হইয়া ঔষধ পর্য্যন্ত বিনা মূল্যে দিয়াছেন।

আমাদের আর সন্তান নাই, একাকী খোকা আমাদের সাত রাজার ধন, সাগর-সেঁচা মাণিক! "খোকা কার মত হইয়াছে," বলিয়া দু জনে যে কত ঝগড়া করিয়াছি, "কে খোকাকে বেশী ভালবাসে," এই এই কথা উপলক্ষে যে কত পলকে প্রলয় হইয়া গিয়াছে, সে সব কথা শুনিলে তোমরা বোধ হয় হাসিয়া ঢলিয়া পড়িবে, এবং আমাদিগকে পাগল মনে করিবে। যদি আমি কখনও বলি যে, "খোকা একটা দাগীচোর; সে তার বাপের চোক মুখ যেন সিঁদ কাটিয়া চুরি করিয়াছে, তা' নাই বা হইবে কেন'—কেমন লোকের বেটা!—" তাহ'লে আর রক্ষা থাকে না, অমনি মুখের কাছে কত ছাঁদে হাত ঘুরাইয়া উনি বলিবেন,—"জানি গো! জানি, আর সাধুপনা জানাইতে হ'বে না,—একবার নিজের বুকে হাত দিয়া দেখ,—কে চোর, তার বিচার পরে হবে। খোকা আর তার বাপ, মাটির দেওয়ালে সিঁদ কাটিয়া চুরি করে, তাতে আর তেমন বাহাদুরী কি আছে?—আমি অনেকের কথা জানি,—তাদের কারো নাম বলতে চাই না,—কারণ তাহ'লে এখনি একটা লম্বা নদি ঘটবে,—যে যার মনে বুঝে দেখুক,—আমি এখন অনেকের কথা জানি,—যারা বাতাসে ফাঁদ পা'তিয়া পরের মন প্রাণ ধরিয়া আনে আর ঘরে বসিয়া তাই নিয়ে বিনা সূতায় ঘুড়ি উড়ায়! খোকা তা'দেরি কারো পেটে হ'য়েছে কি না,—তাই তেমনি করিয়া নেও লোকের মন, প্রাণ চুরি করিয়া বেড়ায়।" রাত্রিতে খোকা কা'র কাছে শোবে, তাই নিয়া যে কত ঝগড়া, কত টানাটানি হইয়াছে, তাহা আর কি বলিব? শেষকালে ভোট নেওয়া হইত, আমাদের দুজনের ভোট অবশ্যই যার যার নিজের দিকে পড়িত, অবশেষে খোকা বাবুর "কাষ্টিং" ভোটে নির্ব্বাচনক্রিয়ার সমাধা হইত। খোকা প্রায়ই তার বাপের পক্ষে ভোট দিত, কারণ একবার ঘুমাইয়া পড়িলে আমার আর জ্ঞান থাকে না। এক এক দিন হয় ত ঘুমের ঘোরে সবটুকু লেপ আমি টানিয়া নিয়াছি, খোকা শীতে কাঁদিয়া উঠিয়াছে, তার পর উনি উঠিয়া কখন যে খোকাকে নিজের কাছে তুলিয়া নিয়াছেন, আমি তাহা টেরও পাই নাই। ওঁর কিন্তু ভারী সতর্ক ঘুম, ভাঙ্গতে কখনও এক ডাকের বেশী দুই ডাক্ লাগে না। খোকার "কাষ্টিং" ভোটেও আমার কিন্তু নিস্তার ছিল না, তাতেও আমাকে দু কথা শুনিতেই হইত,—"ওগো! দেখেছ গো! দেখেছ, এই বয়সেই ছেলেটা তার মামাদের গুণ পেয়েছে, মনে এক রকম, মুখে আর এক রকম,—মনে মনে তোমা-কেই ভালবাসে, কিন্তু প্রকাশ্যে আমাকেই

সোহাগ জানাইয়া, আমার মন রক্ষার জন্য আমার কাছে শুইতে রাজী হইল!" বলিতে কি, আমি ভাল মন্দ কিছুতেই তাঁর সঙ্গে কথায় জিনিতে পারি না। সব কাজেই একটা না একটা কল্পিত খুঁৎ বে'র ক'রে আমাকে দু কথা শুনিয়ে দিবেই দিবে! যদি খোকার ভাত আগে দিই—যদি ভাল মাছখানা খোকাকে দেই, তবে বলে,—"দেখেছ গো! কেমন এক চো'কো,—আজ ছেলে পেয়ে ছেলের বাপকে পর্য্যন্ত তুচ্ছ করা হ'চ্ছে, গুরু লঘু পর্য্যন্ত জ্ঞান নাই, আমায় না দিয়া আগেই আমার ছেলেকে দেওয়া হ'চ্চে! ঘোর কলি গো! ঘোর:কলি!" আবার যদি কোন দিন খোকাকে দিবার আগে উহাকে দেওয়া হয়, তবে আর যাবি কোথায়, "ওমা, দেখেছ, দেখেছ, কেমন পাষাণ প্রাণ, একটু খানি দুধের ছেলে, এত বেলা কিছু খায়নি, ক্ষুধায় মুখ খানা ছোট হ'য়ে গেছে, তবু কিনা তা'কে ফে'লে আমি বুড়ো মানুষ, আমায় আগে দেওয়া হচ্ছে, এমন পাষাণ প্রাণ ত কারো দেখি নাই। কাল মাস কাবার গেছে কি না—(সেদিন হয় ত মাসের ২০শে তারিখ, তবু "মাস কাবার" বলে খোঁটা দিতে কসুর নাই।) এক মুঠো টাকা এ'নে হাতে দিয়েছি, তাই আমার খোসামোদ করা হ'চ্ছে। ধিক্ এমন নীচতায়! আমি বাক্যবাণে জর্জ্জর হ'য়ে এক এক দিন রাগ ক'রে "ভাত খাবনা" বলে গিয়া শু'য়ে পড়েছি। তাতেই কি নিস্তার আছে,—ঢেঁকির স্বর্গেও সুখ নাই,—হয় ত ঠাণ্ডা হাত খানা আমার পিঠে দিয়া, "আহা! তাই ত গো! রাগে মেরুদণ্ডটা পর্য্যন্ত গরম হ'য়ে উঠেছে, একটু ঠাণ্ডা হাত বুলিয়ে দেই,—" মাথা দিয়ে ঘাম প'ড়ছে, একটু বাতাস করি," —এই বলে অমনি নিজের পা হ'তে এক খানা ষ্টকিং খুলে, তাই নিয়া মুখের কাছে হাওয়া করার মত ঘুরা'তে আরম্ভ করলেন। ২।৪ টা পদরজ হয় ত নাকে মুখেই পড়ে গেল,—তখন "ভিক্ষা থাক্, তোর কুকুর ঠেকা"র মত আমাকে "বাপের সুকন্যা" হ'য়ে উঠে ভাত খেতে হয়েছে!

২

—যাক্।—কি বলতে বলতে কোথায় এসে পড়েছি! সকলেই বলিল, "দেশে থে'কে খোকা কিছুতে আরাম হ'বে না, উহাকে পশ্চিম নিয়া যাও।" আমাদেরও যে সে কথা মনে হ'তো না, তা নয়—কিন্তু টাকা কই? উনি সংসারের ধার প্রায় ধারেন না,—সকালে প্রাইভেট পড়াইতে যান, ৯টা ৯½টার সময় ফিরে, খোকার সঙ্গে ২।১টা কথা ব'লেই স্নানাহার অন্তে আফিসে চ'লে যান। আবার সন্ধ্যার আগে আফিস থেকে এসেই, হাত মুখ ধুয়ে একটুখানি যাহা কিছু দিয়ে জল খেয়ে, চৌধুরীদের আড্ডায় দাবা পাশা তাস খেলার শ্রাদ্ধের জন্য যাত্রা। সবাই বলে যে, উনি না গেলে নাকি আড্ডা মোটেই জমে না;—অমন মিছরীর মত তীব্র শ্লেষ বাক্যও কেহ বলিতে পারে না, খেলায় বা গল্পেও কেহ অমন তন্ময় হ'য়ে সকলকে

আমোদিত করতে পারে না। আমি ঘরে যা দিয়া যা করি, কোন কথা নাই,— মাসকাবারে টাকা কয়টি এনে আমার হাতে দিয়েই খালাস! তার জমা খরচ দেনা পাওনা কোন কিছুই জিজ্ঞাসা নাই।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। আগামী বৎসর লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে।

২। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু—হায়দ্রাবাদ রাজ্যের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ইংরাজি ভাষায় কবিতা লিখিয়া প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। হায়দ্রাবাদের গত বন্যায় বিপন্ন দুঃস্থগণের সাহায্য ও সেবা করিয়া নববর্ষের উপাধিবর্ষণ উপলক্ষে ইনি প্রথম শ্রেণীর কাইসর-ই-হিন্দ স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৩। অমৃতসরের মুসলমান-শিক্ষা সমিতির উদ্যোগে গত বৎসর স্ত্রীশিক্ষার জন্য একটী নর্ম্মাল স্কুল স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহাতে এক্ষণে ৮০টী ছাত্রী শিক্ষালাভ করিতেছে। এই স্কুলটী শীঘ্রই কলেজে পরিণত করিবার সঙ্কল্প হইতেছে।

৪। বিগত বকরীদ উপলক্ষে কলিকাতার উপকণ্ঠে টিটাগড়ের হিন্দু ও মুসলমান কুলীদিগের মধ্যে ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। ২৪ পরগণার সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ কমিশনার মহোদয়ের সাময়িক প্রতিকারের ব্যবস্থায় গোলযোগ শীঘ্রই প্রশমিত হয়।

৫। সুপ্রসিদ্ধ ক্রিকেটবীর প্রিন্স রণজীৎ সিংহের সহিত ভারতের কোন বিখ্যাত রাজপুত্রীর পরিণয় স্থির হইয়াছে।

৬। ইটালির মেসিনা নগরে ভীষণ ভূমিকম্পে প্রায় দুই লক্ষ নরনারী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং অসংখ্য ব্যক্তি নিরাশ্রয় হইয়াছে। দুইটী নগর একেবারে বিধ্বস্ত হইয়াছে। দুঃস্থ প্রজাগণের সাহায্যার্থ অর্থ সংগ্রহ হইতেছে।

৭। বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত নারিয়াদে এক লক্ষ টাকা মূলধনে দেশীয় গাছ গাছড়া হইতে ঔষধ প্রস্তুতের এক কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

৮। স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ভারতশাসনভার গ্রহণাবধি এ দেশে ইংরাজ রাজত্ব অর্দ্ধশতাব্দী অতিক্রম করায় গভর্ণমেণ্ট দশ্চাশ টাকার অনধিক বেতনপ্রাপ্ত সকল সরকারি কর্ম্মচারীকে তাহাদিগের এক সপ্তাহের বেতন পুরস্কার মঞ্জুর করিয়াছেন।

৯। ভারতগভর্ণমেণ্ট দেশীয় সিপাহিদিগের দুই টাকা করিয়া বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। কাবুলের আমিরও তাঁহার সৈন্যগণের বেতন এক টাকা হারে বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

১০। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাটের প্রাণরক্ষার জন্য বৰ্দ্ধমানের মহারাজা বাহাদুর "কে, সি, আই, ই" এবং মিঃ বারবার প্রথম শ্রেণীর কাইসার ই-হিন্দ, স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১১। স্বর্গারোহণ। আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ, বঙ্গকবিকুলগৌরব অসীম প্রতিভাশালী নবীন চন্দ্র সেন ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বহুদিনাবধি নানা রোগে শয্যাগত ছিলেন। দয়াময় তাঁহাকে নিজ শান্তিময় ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন। তিনি পেন্‌সন্ লইয়া অধিকতর আনন্দে ও উৎসাহে সাহিত্যসেবায় নিমগ্ন ছিলেন। বঙ্গসাহিত্যাকাশে "নবীন চন্দ্র" নবীন চন্দ্র ছিলেন। সে চন্দ্রের নবীন নবীন জ্যোতি লাভ করিয়া বঙ্গভাষা আলোকিত ও পুলকিত হইয়াছে। তাঁহার গ্রন্থাবলী বঙ্গভাষার অমূল্য ও অক্ষয় সম্পত্তি। নবীন চন্দ্র প্রতিভার জ্বলন্ত চিত্রে নিজ কাব্যে সার্ব্বভৌমিক মহাসম্মিলনের উপদেশ দান করিয়াছেন। যদিও তাঁহার গ্রন্থাবলীই কীৰ্ত্তিস্তম্ভ, তথাপি সেই স্বর্গীয় কবিবরের প্রতি সমুচিত ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন জন্য তাঁহার কোনও স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

১। সাদা ও রক্তামাশয়ে। আপাঙের শিকড়, আমেজ আঠীর শাঁস ও চিনী প্রত্যেক সমান, আমআঠীর শাঁসের রস দ্বারা পেষণ করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। প্রতিদিন সকালে জল সহ সেবন করিবে। ঔষধসেবনের ২ ঘণ্টা পরে বেলের সরবত খাইতে হইবে। ৩ দিনে রোগ দূরীভূত হইবে।

২। বিছা ও বোলতায় কামড়াইলে। কেরোসিন তৈল অথবা চূণ ও নিশাদল দষ্ট স্থানে লাগাইলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা নিবারণ হইবে।

৩। সাদা ও রক্ত আমাশয়ে অপর যোগ। শ্বেত ধূনা ।০ আনা ও কাশীর চিনী ।০ আনা প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় ২ বার সেবন করিবে।

৪। বাধকে ঋতুকালীন মেথী চূর্ণ ।০ আনা ও কাশীর চিনী ।০ আনা মাত্রায় একসঙ্গে প্রতিদিন ৩ বার সেবন করিবে। অপর যোগ —আপাঙের শিকড় ২ রতি মাত্রায় পানের সহিত সেবন করিতে হইবে, ইহাও ঋতুঃকালীন দিনে ১ বার সেবন করিতে হয়।

৫। শ্বেত প্রদর ও রক্ত প্রদরে। দুর্ব্বা ঘাস (সমস্তাংশ) শুষ্ক করিয়া চূর্ণ, নরম গেরিমাটী, ও আতপ চাউল চূর্ণ প্রত্যেক সমান। জল দ্বারা বাটিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী। প্রতিদিন ১ বার মধুসহ সেব্য। ৭।৮ দিনে উপকার হইবে।

৬। শ্বাস কাসে। ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম ।০ আনা, পিপুল চূর্ণ ৵০ আনা, বয়ড়ার শাঁস চূর্ণ ৵০ আনা একসঙ্গে মধু সহ সেব্য।

৭। সুখ-বিরেচক-যোগ। সোণামুখী পাতা চূর্ণ, কিস্‌মিস্ ও মিছরী—প্রত্যেক সমান এক সঙ্গে বাটিয়া ॥০ অর্দ্ধ তোলা প্রমাণ বটিকা করিবে। রাত্রিতে শয়ন কালীন গরম দুগ্ধসহ সেবন করিলে সকালে দাস্ত হইবে।

কবিরাজ শ্রীহরিচরণ দাস গুপ্ত কবিরত্ন।

বামারচনা।

সমদুঃখিনী। *

কে গো বসি একাকিনী, ম্লানমুখী
বিষাদিনী ?
জানিনে কোথায় তুমি চিনিনে তোমারে।
শুনি ও বিষাদ-তান, ব্যথিত আমার প্রাণ,
সাধ হয় কাছে গিয়া আঁখি মুছাবারে।
করি দোঁহে গলাগলি, মরমের কথা বলি
বলি—দিদি! এ সংসার বড় স্বার্থময়!
তাপীতে করিতে স্নেহ, এ দেশে নাহিক কেহ
ব্যথিতে সান্ত্বনা দান এ দেশের নয়।
শুনিতে প্রীতির ভাষা, হেথায় কোরো না
আশা,
তাহলে হতাশা শুধু দহিবে পরাণ।
দিদি গো! সংসার হায়! ভরা শুধু যাতনায়,
অপমান তিরস্কার পাবে হেথা দান।
যাতনা ভরিয়া বুকে, ব্যথা সহি হাসি মুখে
চল বোন! সংসারের কাজ সেরে যাই।
তুচ্ছ এই যাতনায় যেন গো না ভুলি তাঁয়
বিভুর চরণে মতি রহুক সদাই।
অন্তিমে সান্ত্বনা দান, করিবেন ভগবান্
জ্বালাময় হৃদি যেন জুড়াইয়ে যায়।
তাহলে সংসার-জ্বালা, করিবেনা ঝালা-পালা
লভিব অনন্ত শান্তি তখন তথায়।

তোমার কোন বিধবা ভগ্নী।

অভিনন্দন।

হে বর্ষ!
আবার এলে যে ফিরে
আবার গেলে যে ঘুরে
তুমি বর্ষ! চির নিয়ন্ত্রিত;
সাধনা আমায় হায়
পুরালেনা বরাময়!
(আছি) আজও যেন নহি পরিচিত।
যার তরে গণি দিন,
যে চিন্তায় রহি লীন,
সে আশা কি হবে সুনিশ্চিত ?
কত দিবা কত রাতি
জালিয়া নিরাশা-বাতি
থাকি আমি হয়ে চমকিত।

* গত সংখ্যায় "বিষাদে" কবিতার প্রত্যুত্তর।

এ বিশ্বের পরপারে,
সুখময় শান্তিপুরে,
ইচ্ছা হয় করিতে প্রেরিত—
কুশল বারতা তার
আনহে মিত্র আমার!
যার লাগি সদা আকুলিত।

আসা যাওয়া সদা কর,
সুখ দুখ বুকে ধর,
মানবের জীবন-বাঞ্ছিত;
(এ) মিনতি তব পদে,
ঘুচাইয়া অবসাদে,
হে কল্যাণ দেও চিরহিত।

মহাপরীক্ষা।

মহাপরীক্ষার দিন হেরি সমাগত—
দুর্ব্বল হৃদয়ে বল দাও নিরঞ্জন।
ভীষণ তমসাবৃত জীবনের পথ—
আলোক আমার শুধু ও দুটী চরণ।

উত্তাল-তরঙ্গ-সম অনন্ত বিপদ,
ঘেরিয়াছে চারিধার—কোথা নাহি কূল—
যুগল চরণ তরী আমার সম্পদ—
আমার সম্বল-বল-উদ্ধারের মূল।

সহস্র কৃপাণ ওই হেরি উত্তোলিত!
ক্ষণিক চাঞ্চল্যে হবে জীবন সংশয়।
বিষময় যাতনায় হবে বিদারিত,
ভয়—হৃৎপিণ্ড ইহা জেনেছি নিশ্চয়।
অনন্ত-আঁধার পূর্ণ নয়ন আমার,
লক্ষ্যহারা আজি আমি কি হবে উপায়?
আঁধারে আঁধারে ছুটে জগত সংসার।
এ আঁধারে পথ আমি পাইব কোথায়?

ভীষণ তমসাবৃত ভবিষ্য গগন,
নিরাশা নীরদ ঘন ছুটে রাশীকৃত।
না ফুটে, আলোক. হাসি, না চলে পবন,
শুধুই নেহারি গাঢ় কালিমা আবৃত।

কভু কি ভেবেছি আসিবে এমন দিন?
ভ্রূকুটী-ভঙ্গিমা করি চাহিবে আমারে?
মুহূর্ত্তে জীবন-তন্ত্রী করিয়াই ক্ষীণ,
ফেলিয়া চলিয়া যাবে জগত-কান্তারে॥

জ্যোতির্ম্ময় তব পদ একান্ত ভরসা,
দরিদ্রের একমাত্র জীবন সম্বল;
উহাই আমার শুধু একমাত্র আশা,
উহাই আমার শুধু অস্তিত্বের বল।

ওই পাদপদ্ম হৃদে করিয়া স্মরণ,
বিপদ-অঙ্কুশাঘাতে না হই বিকল;
অবলা নারীরে বল দিও নারায়ণ!
করো না তাহার নাথ! জীবন বিফল।

শ্রীমতী সরলা সুন্দরী মিত্র।

২৯।০ মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 546. February, 1909.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৬ বর্ষ। ৫৪৬ সংখ্যা। { মাঘ, ১৩১৫। ফেব্রুয়ারি, ১৯০৯। } ৯ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

এম এ পরীক্ষা ফল—এ বৎসর এম, এ পরীক্ষায় শ্রীমতী হৃদয়বালা বসু দর্শন-শাস্ত্রে সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইলেন।

শুভ পরিণয়—বড় লাট লর্ড মিণ্টো বাহাদুরের কন্যা লেডী ভাইলেট ইলিয়টের সহিত ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউনের পুত্র লর্ড চার্লস ফিট্‌জ মরিসের শুভ পরিণয় গত ৭ই মাঘ কলিকাতা সহরে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ভগবান্ নবদম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করুন।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন—বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধি-বেশন আগামী ১৬ই ও ১৭ই মাঘ রাজসাহি রামপুর বোয়ালিতে হইবে। সুবিখ্যাত ডাক্তার প্রফুল্ল চন্দ্র রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। এই উপলক্ষ্যে প্রাচীন পুঁথি, শিলালিপি প্রভৃতি প্রদর্শিত হইবে।

ব্রাহ্মোৎসব—ব্রাহ্মসমাজের ঊনা-শীতিতম সাম্বৎসরিক মহোৎসব ১লা হইতে ১৮ই মাঘ পর্যন্ত কলিকাতা উপনগর ও অন্যান্য স্থানে সম্পন্ন হইয়াছে।

মৃত্যু—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি বঙ্গের সুবিখ্যাত কবি নবীন চন্দ্র সেন গত ২৩শে জানুয়ারী মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে ইনি চিরজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। ইঁহার অভাবে বঙ্গভাষা একটী উজ্জ্বল রত্ন হারাইলেন। জগদীশ্বর তাঁহার আত্মার শান্তি বিধান করুন।

আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি সুবিখ্যাত প্রফেসর ডি, এন দাস মহাশয় পদতলে জুতার পেরেকের ক্ষতে মলম লাগাইবার সময় রক্ত বিষাক্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি অত্যন্ত বিজ্ঞ, স্বাধীনচেতা, নির্ম্মলচরিত্র লোক

ছিলেন। ভগবান্ তাঁহার আত্মায় শান্তি বিধান করুন।

নির্ব্বাসন—স্বদেশসেবক শ্রীযুক্তঅশ্বিনী-কুমার দত্ত, কৃষ্ণ কুমার মিত্র, মনোরঞ্জন গুহ, সতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুবোধ চন্দ্র মল্লিক, ভুপেশ চন্দ্র নাগ, পুলিন-বিহারী দাস ও শচীন্দ্র প্রসাদ বসু প্রমুখ নয় জনকে গবর্ণমেন্ট আদেশে, নির্ব্বাসিত করিয়া ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখা হইয়াছে।

ডাক বিভাগের সংস্কার—কলিকাতা বাসীরা যাহাতে সহজে পত্রাদি ডাকে দিতে পারেন, তাহার সুবিধার জন্য ডাকবিভাগ হইতে প্রত্যেক বাড়ীতে একটী করিয়া বাক্স দিবার ব্যবস্থা করিতেছে। এই বাক্সের দুইটী খাম থাকিবে। একটী পত্র ডাকে দিবার এবং অপরটীতে পত্র থাকি-বার ঘর থাকিবে। বাৎসরিক ১২৲ টাকা দিলেই এইরূপ বাক্স দেওয়া হইবে।

প্রমাণ-পঞ্জী।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

কার্পাসজাত বস্ত্র-শিল্পের আদিম জন্মভূমি এই ভারতভূমি। ঋগ্বেদে উল্লিখিত কার্পাস বস্ত্রের উল্লেখ দেখিয়া সে সময়ে কার্পাস-বস্ত্রের নির্ম্মাণ ও প্রচলন সম্বন্ধে নিঃসন্দি-হান হইতে হয়। আসিয়াটীক সোসাইটীর পত্রিকা হইতে এতদ্বিষয়ক একটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম ;—

"India is according to our knowledge the accredited birth place of cotton manufacture. In one of the hymns of Rig Veda said to have been written fifteen centuries before era, reference is made to "cotton in the loom there", at which early date therefore it must have acquired some considerable footing—Vol. XVII, Journal of the Royal Asiatic Society.

"কৌষেয়বসনং তথা" (কৌষবস্ত্র পরি-হিতা,—যজুর্ব্বেদীয়-সন্ধ্যা প্রয়োগঃ) এবং "রক্তাবাসাস্ত্রিনেত্রা" (রক্তবসনা ত্রিনয়না —গায়ত্রীহৃদয়ম্) বচনদ্বয় বৈদিক যুগের বিবিধ বিচিত্র বস্ত্র-শিল্পের পরিচায়ক।

বৈদিক ভাষায় (ঋগ্বেদে) "সূচী" ও "সীবন" (needle and sewing) প্রাচীন কালের পরিচ্ছদ প্রস্তুত কাপের সাক্ষ্য দিতেছে। বৈদিকযুগে দেশে ম, রেসম ও তুলাজাত বস্ত্রাদির বিশেষ উল্লেখ ও দেখিতে পাওয়া যায়। তাৎকালিক ব্যাকরণকার পাণিনীর ব্যাকরণে "কৌষিক" কথার বিশেষ সংজ্ঞা দেখিয়া এতদ্বিষয়ক প্রমাণে সন্তোষ লাভ করিতে হয়। তখনকার ব্যবহার্য্য সূচীশিল্পের নিদর্শন স্বরূপ অঙ্গরাখা, জামা, পায়জামা ও বর্ম্ম প্রভৃতির যথেষ্ট উল্লেখ আছে।

পণ্ডিত ৺রাজেন্দ্র লাল মিত্রও এ বিষয়ে অভিন্ন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

জাতিভেদ-প্রথার উল্লেখজনিত অপরাধে ঋগ্বেদের পুরুষসূক্ত মতানৈক্যে (৪) আধুনিক বলিয়া কথিত হইলেও তত্ত্বানুসন্ধিৎসু বিজ্ঞ সুধীমণ্ডলীর যুক্তি, নিরপেক্ষ অনুসন্ধান ও উপযুক্ত প্রমাণ দ্বারা তাহার প্রাচীনতা গ্রাহ্য হইয়াছে। উক্ত সূক্তাবলীতে ছুতার (তক্ষা), কামার, বৈদ্য, রথনির্ম্মাতা, বয়নকারী তাঁতি, রসারসি, চর্ম্ম এবং জল বহনার্থ মসক বা ভিস্তি (ছুতি) প্রভৃতির উল্লেখও সেহায়েৎ মন্দ সাক্ষ্য নহে। ঐতিহাসিক মুর সাহেব তদীয় Sanskrit Texts নামক পুস্তকে ইহার পোষকতা করিয়াছেন।

বৈদিক যুগে ধাতুনির্ম্মিত পাত্রাদির নির্ম্মাণ-নৈপুণ্য বিষয়েও প্রমাণাভাব নাই। ঋগ্বেদে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, পিত্তল ও ব্রোঞ্জ ধাতুনির্ম্মিত পাত্র ও অস্ত্র সকলের উল্লেখ আছে। এখানে শ্রুতির মূল বচন উদ্ধৃত না করিয়া এ সম্বন্ধে পণ্ডিত ৺রাজেন্দ্র লাল মিত্র কৃত সটীক অনুবাদটী প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করিলাম ;—

"The Rig Veda alludes to golden cups and silver, copper, brass and bronze which were wellknown and used in the formation of weapons were it is to be presumed, not neglected."

বৈদিক ব্রাহ্মণ গ্রন্থে যজ্ঞবেদী সমূহের নির্ম্মাণ বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা যায় যে উহারা ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত হইত। সুতরাং তৎকালে হর্ম্ম্যশিল্প অর্থাৎ ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহাদি ছিল বলিয়া উপলব্ধি হয়।

বৈদিককালে বৃহৎ যুদ্ধাদি উপলক্ষে রথীতে রথীতে, পদাতিকে পদাতিকে যে ভীষণ সম্মুখযুদ্ধ হইত তাহাই ধর্ম্মযুদ্ধ বলিয়া কথিত হইত। বিবিধ মণিরত্নাদি-ভূষিত বীরসজ্জায় সজ্জিত বর্ম্মকবচধারী রথিবৃন্দ ধনুর্ব্বাণ সহ ধ্বজা পতাকা শোভিত রথারোহণপূর্ব্বক বিপক্ষ পক্ষীয়গণের সমক্ষে উপস্থিত হইত। যুদ্ধস্থলে রথারূঢ় সেনাপতির পার্শ্বে অতিরিক্ত (reserve) রথও প্রস্তুত থাকিত। একখানি রথ ভগ্ন অথবা অকর্ম্মণ্য হইলে সেনাপতি অন্য রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে পারিত। আর্য্যগণ যে, এ সময়ে যুদ্ধকালে রথ ব্যবহার করিতেন ঋগ্বেদের ৫-৬২-৬, ৬-২৯-২ ও ১৬-২ ইত্যাদি স্থল তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ দিতেছে। এতদ্বিষয়ে পণ্ডিত ৺ রাজেন্দ্র লাল মিত্রের অভিমত ও অনুকূল। তিনি লিখিয়াছেন ;—

"Driving was perhaps more fashionable than riding, for the principal heroes always appeared in battle, as among the ancient Assyrians and Egyptians, on chariots and prized themselves on being rathis or owners of cars. Mounted troops, however, were more common, and in the Rig Veda Agni is in one place invoked "to come mounted on a rapid courser" and in

another place is likened to a riderbearing steed." The Aswins made Pedu "mount a swift charger"

* * * * *

"The ancient chariots were highly prized, and great pains were taken to embellish them in a manner befitting the rank of the owner. In the Rig Veda, they were frequently described as of "gold" or "golden." One is described as ornamented with "three metals" supposed to have been gold, silver and copper; others as having gold fellies or wheels, and golden trappings."

ঋগ্বেদের ৪র্থ মণ্ডলে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে দ্রব্যাদি লইয়া যাইবার জন্য শকট বা যানের উল্লেখ দেখা যায়। যথা—

শ্রীণীতাশ্বান্ হিতং জয়াথ
স্বস্তি বাহং রথমিং কৃণুধ্বং ॥ ৭ "

ঘোটকদিগকে পরিতৃপ্ত কর; ক্ষেত্রে সংস্থাপিত ধান্য গ্রহণ কর, নিরুপদ্রবে ধান্য বহন করিতে পারে, এতাদৃশ রথ বা যান প্রস্তুত কর।

"আতুবিং চ হরিমীং দ্রোরুপস্থে
—বাসী ভিস্তক্ষতাশ্মন্ময়িভিঃ।
পরিষ্বজং দশকক্ষ্যাভিরুভে
ধুরৌ প্রতি বহ্নিং যুনক্তং ॥ ১০
উভেধুরৌ বহ্নি বাপিব্দমানো—
—হৃত যৌমেব চরতি দ্বিজানিঃ।
বনস্পতিং বন আস্থা পয়ধ্বং
নিযুর্ধি ধ্বমধনংত উৎসং ॥ ১১ "

কাষ্ঠময় পাত্রে সংস্থাপিত হরিদ্বর্ণ সোমরসে দুগ্ধ সেক কর। প্রস্তরময় কুঠার দ্বারা পাত্র প্রস্তুত কর। দশাঙ্গুলি দ্বারা পাত্রটী বেষ্টন পূর্ব্বক ধারণ কর। বহনকারী পশু রথের ধুরাদ্বয় শব্দায়মান করিয়া বিচরণ করিতেছে। যেন দুই ভার্য্যার স্বামী ক্রিয়া করিতেছে। কাষ্ঠনির্ম্মিত শকটে ইহার কাষ্ঠময় আধারে আরোপণ কর, উত্তমরূপে সংস্থাপন কর, ইহার মূলদেশ যেন খনন করিও না অর্থাৎ শকট যেন আধারভ্রষ্ট না হয়। বৈদিকযুগের এই রথশকটাদি প্রয়োজনীয় শিল্পসংক্রান্ত তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের দেশের সর্ব্বজনবিদিত প্রত্নবিদ্ পণ্ডিত ৺ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় আমাদের অবগতির জন্য বেদ হইতে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহারই একটু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি;—

"The Rig Veda makes mention of waggons; so do the great national epics; and the lexicon of Amara Sinha gives distinct names of covered conveyances of several kinds, as also for open carts for the carriage of goods."

বৈদিককালের হিন্দুগণ, কি বস্ত্রশিল্প, কি ধাতু শিল্প, কি নৌশিল্প, কি সমুদ্রযাত্রা দ্বারা বাণিজ্য ব্যবসায়ে ধনাগম প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ে সবিশেষ নিপুণতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। এখনও পাশ্চাত্য জগতের ভ্রান্তি অপনোদিত হয়

নাই,—সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, দীক্ষিত অনেক ভারতবাসীরও উহাদের ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের উপর স্থাপিত সুদৃঢ় আস্থার তিলমাত্রও হ্রাস হয় নাই। আজিও পাশ্চাত্যজাতি ফিনিসীয়গণকে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রথম পোতনির্ম্মাতার গৌরব ও সম্মানজনক আসন দিতে চাহে, আজিও ভারতসন্তান তাহাদের দারুণ পক্ষপাতিত্বকে অভ্রান্ত সত্য স্বরূপে শিরোধার্য্য করিয়া লয়। পৃথিবীর নিরপেক্ষ প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর অনুসন্ধানে, আলোচনায়, সদ্বিচার ও সদ্বিবেচনায় প্রাচীন হিন্দুগণের সর্ব্ব প্রথম পোতনির্ম্মাণ বিষয়ক উদ্ভাবনীশক্তি সেই প্রতিষ্ঠাজনক পদবীর সম্মান প্রাপ্তির জবরদস্ত হকদার স্বরূপে চিরদিনই অক্ষুণ্ণ রহিবে। বেদের হীরকখচিত উজ্জ্বল স্বর্ণপটল ও মন্ত্রসংহিতার স্বর্ণলিপিমালা যাবৎ বিদ্যমান থাকিবে, তাবৎ পৃথিবীর বক্ষ হইতে ভারতসন্তানের শিক্ষা, সভ্যতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক গৌরব গরিমা মুছিয়া ফেলিবার শক্তি কাহারও নাই।

আর একটী কথা বলিয়া বেদের অভ্রান্ত সাক্ষ্য আদায় শেষ করিব। বেদকে আর একবার সাক্ষ্যমঞ্চে উপস্থিত করিব। আগ্নেয়াস্ত্র নির্ম্মাণ ও ব্যবহার বিষয়ে বৈদিক হিন্দুগণ অনভিজ্ঞ ছিল না, তাহা "প্রাচীন হিন্দুগণের আগ্নেয়াস্ত্র নির্ম্মাণ ও বারুদাদি ব্যবহার" বিষয়ক পৃথক্ প্রসঙ্গে আলোচনা করিব বলিয়াই এখানে তদ্বিষয়ক বিবরণ বা প্রমাণের উল্লেখে ক্ষান্ত রহিলাম। আগামীবারে বৌধায়নের সাক্ষ্য গ্রহণ করিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীশরচ্চন্দ্র বিদ্যানিধি।

পুত্র ভিক্ষা। *

১

দৈত্যরাজ!

নহি আমি "রাজরাণী"
জগতের কাঙ্গালিনী,
দরিদ্র প্রজার নারী সেও ভাগ্যবতী,
আমি দীনা অশরণা,
বিধাতার বিড়ম্বনা,
"কয়াধু"র পোড়াভালে এতই দুর্গতি?

২

জগতের ইতিহাসে,
হেন দিন কার আসে,
কাহার দুধের ছেলে প্রাণদণ্ড পায়,
পরশিলে পুত্র-দেহ,
কার না উছলে স্নেহ,
চুম্বিতে সে চাঁদমুখ কে না গ'লে যায়?

৩

জানি তব রাজ-করে,
ন্যায়দণ্ড শোভা করে,
তবুও বুকের মাঝে জাগিছে তো প্রাণ,
আছে দয়া মায়া তা'য়,
অশ্রু আছে বেদনায়,
অভাগীর আশা তাই করিছে আহ্বান।

* হিরণ্যকশিপু নিকটে প্রহ্লাদের জীবন রক্ষার্থে মহিষী কয়াধুর প্রার্থনা।

৪

ভিখারিণী মাগে আজ,
দেহ ভিক্ষা মহারাজ!
দাসীর নয়নতারা হৃদয়ের সার,
অবোধ শিশুর প্রাণ,
দুঃখিনীরে দেহ দান,
ত্রিভুবনে ধন্য হোক তব মহিমায়।

৫

সে যে শিশু খেলা ঘরে,
ছেলে খেলা নিত্য করে,
সে বোঝেনা রাজবিধি রাজদণ্ড-ভয়,
"ধর্ম্মদ্রোহী" বলি তারে,
বিনাশিবে কি বিচারে,
প্রতিহিংসা গ্রাসিয়াছে ও পিতৃ হৃদয়?

৬

আজো বাছা ঘুম-ঘোরে,
জড়াইয়া ধরে মোরে,
আজিও লাগিলে ক্ষুধা করে অভিমান,
একটী ধমকে মম,
যমুনা-জাহ্নবী-সম,
আঁখি জলে ভেসে যায় সে চাঁদ বয়ান!

৭

মিলি যত সখা সাথী
কি উল্লাসে উঠে মাতি,
দিগন্ত কাঁপায়ে ছুটে আনন্দের রোল,
চাহি তার মুখ পানে,
কি যে সুখ জাগে প্রাণে,
মরমে ফেণায়ে উঠে সুধার হিল্লোল।

৭

সে মোর প্রভাত-রবি,
সায়াহ্ন-চাঁদের ছবি,
সে যে মোর নবফুট বসন্তের ফুল,
আ মরি সে চন্দ্রানন,
জীবন যুড়োনো ধন,
সে যে আঁচলের নিধি, জগতে অতুল!

৯

তারে নাকি—হরি! হরি!—
কহিব কেমন করি,
তারে নাকি লুটাইবে করি-পদতলে,
শিলা বাঁধি তার গলে,
ডুবাইবে সিন্ধুজলে,
তারে নাকি পোড়াইবে অভিচারানলে?

১০

—নানা—সবে মিছা কয়,
মহারাজ! তা'কি হয়,
ননীর পুত্তলী মম সোণার প্রহ্লাদ,
জনক—পালক তারে
কভু কি নাশিতে পারে,
হিয়া তো অশনি নহে—
নহ তো নিষাদ!

১১

শিশু-মুখে "হরি" নাম,
যেই দিন শুনিলাম,
নীরবে হৃদয়তন্ত্রী উঠিল বাজিয়া,
হোক হরি তব অরি,
তবু শুন শ্রুতি ভরি,
পাপের আসক্তি সব যাইবে ঘুচিয়া।

১২

না গো না—সে "ভক্তি-দোষে"
পড়িয়াছে রাজ-রোষে,
অভাগিনী মাগে ভিক্ষা পাতিয়া অঞ্চল,
নাহি চাহি রাজ্যধন,
নাহি অন্য প্রয়োজন,
প্রহ্লাদে ফিরায়ে দেহ প্রাণের সম্বল।

১৩

সুখে রাজ্য কর তুমি,
তৃপ্ত হোক দৈত্যভূমি,
দূরে থাকি দিব নিত্য শত নমস্কার,
অবোধ শিশুর প্রাণ,
দেহ আজি ভিক্ষা দান
ত্রিভুবনে জয় হোক তব করুণার।

লেখিকা
শ্রীমা—

ভারতীয় আর্য্য সহধর্ম্মিণীর দায়িত্ব।

দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ।
তপস্তপ্ত্বাসৃজদ্যন্তু স স্বয়ংপুরুষোবিরাট্।
তং মাং বিত্তাস্য সর্ব্বস্য স্রষ্টারং দ্বিজসত্তমাঃ।

মনুসংহিতা।

অনুবাদ। সেই প্রভু আপন দেহ দুই খণ্ড করিয়া অর্দ্ধাংশ পুরুষ ও অর্দ্ধাংশ নারী হইলেন। এই উভয়ের সংযোগে বিরাট নামক পুরুষ সৃষ্টি করিলেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! সেই বিরাট পুরুষ তপস্যা করিয়া যাঁহাকে নির্ম্মাণ করিলেন, আমাকে সেই সর্ব্বস্রষ্টা মনু বলিয়া জানিবে।

মানবদিগের আদি পুরুষ বেদার্থপ্রকাশক ভগবান্ মনু উল্লিখিত শ্লোকদ্বয় দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ভগবানের শরীর হইতে স্ত্রী ও পুরুষ সর্ব্ব প্রথমে উৎপন্ন হইয়া এই জগতের সমস্ত মানবদিগের আদি পুরুষ মনুকে সৃষ্টি করিলেন। সুতরাং সৃষ্টির আদি হইতে অনুসন্ধান করিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্ত্রী পুরুষ লইয়াই সংসার। সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র সকলও তন্মতের পোষকতায় প্রকৃষ্ট প্রমাণ দিয়া থাকে।

যেমন প্রকৃতি ও পুরুষ দুইয়েরই সহ-যোগে সৃষ্টি হইয়াছে, তেমনি সংসারনির্ব্বাহ কার্য্যও স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই সহায়তার প্রয়োজন। কেবল মর্ত্তাভূমিতে মানবদিগের সংসারনির্ব্বাহ কথাটী বলিলে ঠিক্ হয় না। স্বর্গে দেবতাগণের দেবত্বনির্ব্বাহ এবং দেব-কার্য্যও দেবীগণ সহ সম্মিলনাত্মক। তাই ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মাণীসহ ব্রহ্মা, গোলকে লক্ষ্মী-নারায়ণ ও কৈলাসে উমামহেশ্বর বিরাজিত থাকেন বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। স্ত্রী ও পুরুষরূপী পরমাত্মা সমভাবে অর্চ্চনার যোগ্য, তাই ভক্তগণ মাতৃভাবে ও পিতৃভাবে পরমেশ্বরকে অর্চ্চনা করিতে জানেন। প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে প্রকৃতির মাহাত্ম্য অধিক, ইহা নির্দ্দেশ করিবার জন্যই বুঝি অগ্রে রাধার নাম উচ্চারণ করিয়া কৃষ্ণের নাম, অগ্রে সীতার নামোচ্চারণ করিয়া পরে রামের নাম ও অগ্রে উমার নামোচ্চারণ করিয়া পরে মহেশ্বরের নামোচ্চারণের অনুশাসন শাস্ত্রে বিদ্যমান আছে। পুরাণ ও সংহিতায় কীর্ত্তিত আছে যে যদি

মাতা ও পিতা একত্র বর্ত্তমান থাকেন, তবে অগ্রে মাতাকে প্রণাম করিয়া পরে পিতাকে প্রণাম করিবে। বেদের ষড়ঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণ এক অঙ্গ। সেই ব্যাকরণ শাস্ত্রেও দ্বন্দ্ব সমাস প্রকরণ বলিবার সময় পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক পদের মধ্যে স্ত্রী-বাচক পদটী পূর্ব্বে প্রয়োগের ব্যবস্থা থাকাতে স্ত্রীজাতির পূজিতত্বই প্রকটিত হইয়াছে। তন্ত্রবিশেষে লিখিত আছে,—ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী শক্তিই সৃষ্টি করেন, বিষ্ণুর বৈষ্ণবী শক্তিই পালন করেন, রুদ্রের রুদ্রাণী শক্তিই নাশ করেন। ঐ সকল শক্তি ভিন্ন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র শবতুল্য। দেবগণের দেবত্বই যখন দেবিগণসহ মিলনভাবাত্মক এবং আমাদিগের নানা শাস্ত্রের নানা প্রকারের মতানুসারে স্ত্রী-জাতির মাহাত্ম্য এতই উৎকর্ষ-পরিচায়ক, তখন নারীদিগের সমবেত শক্তি ভিন্ন যে এই সংসারে নরত্ব অপূর্ণ থাকে, তাহা বলা বাহুল্য।

যত দিন মনুষ্য বিবাহিত না হয়, তত-দিন শাস্ত্রানুসারে ও সমাজের পদ্ধতি অনু-সারে তাহাকে অপূর্ণ বা অৰ্দ্ধশরীর ধরা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের অন্তর্গত মথুরা প্রভৃতি স্থানে, কোন কোন শ্রেণীর লোক-দিগের মধ্যে আশ্চর্য্যরূপে তাহাদের পরিচয় প্রদানের রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। মনে করুন,—কাহারা তিন ভাই বা চারি ভাই এবং তাহাদের মধ্যে একজন বিবাহ করে নাই। সেই ভ্রাতৃগণের মধ্যে যদি কাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায়, তোমরা কয় ভাই? তদুত্তরে তাহারা বলিয়া থাকে,—আমরা আড়াই ভাই বা সাড়ে তিন ভাই। এখানে এ কথা বলা বাহুল্য যে অবিবা-হিত ভাইটীকে অৰ্দ্ধেক ধরিয়া তাহারা ঐরূপ পরিচয় দেয়। যদিও ভারতের সর্ব্বত্র ঐরূপ পরিচয় প্রদানের রীতি নাই, তথাপি ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে অবিবাহিত ভ্রাতাটী অৰ্দ্ধ শরীর বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

পত্নী ভিন্ন যে গৃহস্থ সংসারধর্ম্ম পালনের অযোগ্য, মনুষ্যের কর্ত্তব্য সাধনের অযোগ্য, সুতরাং মনুষ্য নামের অযোগ্য এ বিষয়ে শাস্ত্রে যথেষ্ট অনুশাসন আছে। শকুন্তলা হস্তিনাপুরীতে দুষ্মন্তের নিকটে উপস্থিত হইয়া যখন বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার কথা দুষ্মন্তের মনে নাই, তখন তিনি বিবিধ ধর্ম্মপ্রসঙ্গক্রমে উহা বুঝাইবার জন্য পত্নীর উপযোগিতা সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন ;

অৰ্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্য ভার্য্যা মূলং তরিষ্যতঃ॥
ভার্য্যাবন্তঃ ক্রিয়াবন্তঃ স ভার্য্যা গৃহমেধিনঃ।
ভার্য্যাবন্তঃ প্রমোদন্তে ভার্য্যাবন্তঃ শ্রিয়া-
ন্বিতাঃ॥
সখায়ঃ প্রবিবিক্তেষু ভবন্ত্যেতাঃ প্রিয়ম্বদাঃ।
পিতরো ধর্ম্মকার্য্যেষু ভবন্ত্যার্ত্তস্য মাতরঃ॥
কান্তারেম্বপি বিশ্রামো জনস্যাধ্বনিকস্য বৈ।
যঃ সদারঃ স বিশ্বাস্যস্তস্মাদ্দারাঃ পরা গতিঃ॥
আদিপর্ব্ব।

অনুবাদ। মনুষ্যের ভার্য্যা অৰ্দ্ধাঙ্গ, ভার্য্যাই শ্রেষ্ঠতম সখা, ভার্য্যাই ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের মূল, ভার্য্যাই সংসার

কারণের মূল। যাহাদের ভার্য্যা আছে, তাহারাই আমোদ প্রমোদে কাল হরণ করিতে পারে, যাহাদের ভার্য্যা আছে, তাহারাই লক্ষ্মীবান্। প্রিয়ম্বদা ভার্য্যা নির্জ্জন স্থানে সৎপরামর্শ দান করে বলিয়া সখাতুল্য, ধর্ম্মকর্ম্মে পিতার তুল্য অর্থাৎ পিতা যেমন সন্তানের পালন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তেমনি পত্নীও পতির ধর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহ করে। ভার্য্যা পীড়িতাবস্থায় সেবা শুশ্রূষা করে বলিয়া মাতার তুল্য। ভার্য্যা দুর্গম কান্তারে পথিক স্বামীর বিশ্রামস্থল। যাহার ভার্য্যা আছে, তাহাকেই সকলে বিশ্বাস করে, অতএব মনুষ্যের ভার্য্যাই পরমা গতি।

দেশবিশেষে স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী বলিয়া বিবেচিত হয় না। কোন কোন দেশে পুরুষ, স্ত্রীকে কেবল দাসীর ন্যায় ভাবে। কোন কোন দেশে স্ত্রী, বেশ্যা প্রভৃতির ন্যায় কেবল উপভোগসামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হয়। কোন কোন দেশে স্ত্রী, যুক্তিবদ্ধ হইয়া বা লেখা পত্রাদি দ্বারা রাজগোচর করাইয়া স্বামী গ্রহণ করে, আবার কারণ প্রদর্শন দ্বারা সেই যুক্তি ভঙ্গ করিয়া বিবাহ বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্নও হইতে পারে। কোন কোন দেশে স্ত্রীলোক গতযৌবনা হইয়া প্রৌঢ়াবস্থায় বা বৃদ্ধত্বের সমকালে উত্তরাধিকারিণী হইবার অভিপ্রায়ে বা সেই প্রৌঢ়াদি অবস্থায় প্রতিপালিত হইবার কল্পনায় স্বামী মনোনীত করিয়া লয়। ঐ সকল দেশে প্রকৃত বিবাহের উদ্দেশ্য ও স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ যথারীতি ভাবে প্রতিপালিত হইতে দেখা যায় না। হিন্দুদিগের মতে বিবাহকালে মন্ত্র পাঠ সহকারে যে প্রতিজ্ঞা করা হয় পতি ও পত্নীর সেই ধর্ম্মবন্ধনে বদ্ধরূপ যুক্তিই লেখাপত্রাদি দ্বারা রাজগোচররূপ যুক্তি হইতে বহুগুণে দায়িত্বপূর্ণ। আর্য্যশাস্ত্র ও আর্য্যরীতি অনুসারে স্ত্রীর সহিত স্বামীর বহুপ্রকার সম্বন্ধ আছে। কৈকেয়ীর মুখে রাম-বনবাসরূপ নিষ্ঠুর প্রার্থনা শুনিয়া মহারাজ দশরথ কৌশল্যার গুণ সকল উদ্দেশ করিয়া কৈকেয়ীকে এইরূপ বলিয়াছিলেন ;—

যদা যদা চ কৌশল্যা দাসীবচ্চ সখীব চ।
ভার্য্যাবদ্ভগিনীবচ্চ মাতৃবচ্চোপতিষ্ঠতে॥
সততং প্রিয়কামার্থে প্রিয়পুত্রা প্রিয়ম্বদা।
ন ময়া সৎকৃতা দেবি! সৎকারার্হা কৃতে তব॥
অযোধ্যাকাণ্ডম্।

অনুবাদ। যখন যেরূপ ভাবে সেবা করা প্রয়োজন হইত, তখন তখনই কৌশল্যা আমাকে দাসীবৎ, সখীবৎ, ভার্য্যাবৎ, ভগিনীবৎ ও মাতৃবৎ সেবা করিত। আহা! আমি তোমার জন্য সতত প্রিয়কামা, প্রিয়পুত্রা, প্রিয়ম্বদা ও সৎকারযোগ্য সেই দেবীকে সৎকার করি নাই।

সীতাহরণের পর শ্রীরামচন্দ্র জানকীর গুণাবলী স্মরণ করিয়া লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিয়াছিলেন ;—

কার্য্যেষু মন্ত্রী করণেষু দাসী
ধর্ম্মেষু পত্নী ক্ষময়া চ ধাত্রী।
স্নেহেষু মাতা শয়নেষু বেশ্যা
রহঃ সখী লক্ষ্মণ সা প্রিয়া মে॥

মহানাটকম্।

ভাবানুবাদ। লক্ষ্মণ! আমার সেই প্রিয়া জানকী কার্য্যকলাপে সংপরামর্শ দান দ্বারা মন্ত্রিতুল্যা, বহু সেবা কার্য্য দ্বারা তুষ্টি বিধান করিয়া, দাসীতুল্যা, ধর্ম্মকর্ম্ম সমূহ সম্পাদনে সহকারিণী থাকিয়া, প্রকৃত পত্নী, বহু দোষে ক্ষমা করিয়া সর্ব্বংসহা-ধরিত্রী তুল্যা, বিবিধ প্রকার স্নেহ প্রকাশ দ্বারা মাতৃতুল্যা, শয়নকালে মনোরঞ্জন বিধান দ্বারা বারাঙ্গনা এবং হাস্য পরিহাস ও বিশ্রম্ভালাপে সখীতুল্যা।

স্ত্রী কর্ত্তৃক এইরূপ বহু প্রকারের বহু প্রয়োজন সাধিত হয় বলিয়া এবং প্রকৃত সুশিক্ষা ভিন্ন ঐ সকল প্রয়োজন সাধিত হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া, আমাদের দেশে প্রাচীন কাল হইতে পুরুষ অপেক্ষা কিছু পৃথক্ ভাবে স্ত্রীশিক্ষার উচ্চ ধরণের রীতি প্রবর্ত্তিত আছে। আপন আপন গৃহে প্রত্যেক গৃহস্থই রাজা, প্রত্যেক গৃহিণীই রাণী ও প্রত্যেক গৃহস্থালয় একটী ক্ষুদ্ররাজ্য এরূপ নির্দ্দেশ করিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই রাজ্যে গৃহস্থ সর্ব্বদা অর্থ-চিন্তাদি বাহিরের কার্য্য লইয়াই ব্যস্ত থাকেন, স্ত্রী অন্তঃপুররাজ্যে কর্ত্তৃত্ব করেন। পুরুষের অর্থ-চিন্তাদি বাহিরের কার্য্য অপেক্ষা স্ত্রীজাতির অন্তঃপুরের কার্য্য বিভাগ অনেক বিষয়েই অধিক দায়িত্ব-পূর্ণ।

(ক্রমশঃ)

ভাগবদুপাখ্যান।

উদ্ধবসংবাদ।

হে উদ্ধব! তুমি শ্রৌত বিধি ও স্মার্ত্ত বিধি, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বদেহীর আত্মারূপ আমার শরনাপন্ন হও, তাহা হইলে মদ্ভাব প্রাপ্তান্তর অকুতোভয়ে, সর্ব্বদা বিচরণ করিতে পারিবে। এখানে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যোগ ও ভক্তি সম্বন্ধে অর্জ্জুনকে যেরূপ উপদেশ দিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবতে উদ্ধবকেও সেই উপদেশই দিয়াছেন, ভগবান্ গীতায় অর্জ্জুনকে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে উদ্ধবকে একই কথা বলিতেছেন। "সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম আমার পরম বাক্য শ্রবণ কর। আমাতে মন অর্পন কর আমার ভক্ত হও আমাকে নমস্কার কর। আমার মতন হইয়া আমার ভক্ত হও। ভক্তি সাধন নহে, ইহা সাধ্য। বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া আত্মাকে আমাতে সন্নিবিষ্ট করিয়া সর্ব্বদা ধ্যানযোগে রত থাকিয়া অহঙ্কার, বল, দর্প, ক্রোধ, অভিমান ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া, নির্ম্মম ও শান্ত হইয়া সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইতে পারিলে তবে আমার ভক্ত হওয়া হয়। এই যে বিশুদ্ধা ভক্তি, ইহাই জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ।" উদ্ধব কহিলেন, হে কৃষ্ণ! মনুষ্যেরা বিষয়

সকলকে অনিত্য ও বিপদের আধার স্বরূপ জানিয়াও কেন তাহাতে আবদ্ধ হয়? কুক্কুর যেমন কুক্কুরীতে আসক্ত হয়, তিরস্কৃত হইলেও পলাইতে পারে না, গর্দ্দভ রজকের প্রদর্শিত তৃণমুষ্টি ভোজনান্তে যেমন ভার বহন করে, সেইরূপ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরাও বিষয় সকল বন্ধনের কারণ হইলেও কেন তাহার উপভোগে প্রবৃত্ত হয়? তদুত্তরে ভগবান্ বলিলেন, সনকাদি ঋষিগণ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ইহার উত্তর দানে অসমর্থ হইয়া আমাকে চিন্তা করিয়াছিলেন; আমি পরম-হংসরূপে তাঁহার চিত্তে উদিত হইয়া যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা তোমাকে বলি শ্রবণ কর। মন, বাক্য, চক্ষু ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা গ্রহণ করা যায়, সকলই আমি এবং এই ইন্দ্রিয়াদিও আমার সত্তা ও শক্তি ভিন্ন কিছুই গ্রহণ বা বর্জ্জন করিতে পারে না। অন্তঃকরন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, বিষয় সকলও অন্তঃকরণকে অধিকার করে, কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিবে ঐ বিষয় ও অন্তঃকরণ উভয়ই মদাত্মক জীবের সত্ত্ব, রজ, তমোগুণান্বিত বহিরঙ্গ মাত্র। অতএব পুনঃপুনঃ বিষয় সেবাদ্বারা তৎসংস্কারবশতঃ বিষয়ে আবিষ্টচিত্ত এবং বাসনারূপে চিত্ত হইতে সম্ভূত বিষয় সকলও আমার বাহ্যস্বরূপ হইলেও ইহা জীবের অভ্যুদয় হেতু বিবর্ত্ত মাত্র। জীবের চৈতন্যোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত ইহারা জীবকে মোহিত করে। জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি বুদ্ধির বৃত্তি হইলেও ইহারা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের কার্য্য, জীব ইহাদের সাক্ষি-রূপে বর্ত্তমান হইয়াও তাহাদিগের হইতে আপনাকে ভিন্ন ভাবনা করিতে সক্ষম না হওয়া পর্য্যন্ত সুখ দুঃখে ভাগী হয়। যত দিন না জীবের আত্ম-অনাত্ম জ্ঞান যুক্তি দ্বারা নিবৃত্ত না হয়; ততদিন অজ্ঞান প্রযুক্ত জীবের যে জাগ্রত অবস্থা তাহা স্বপ্নদেহে জাগ্রদবস্থার ন্যায়। আত্মা ভিন্ন অন্য বস্তুর অসত্ত্ব হেতু দেহাদির বর্ণাশ্রমাদিরূপ যে ভেদ এবং ভোগাদিরূপ সুখ দুঃখ এ সমুদায়ই আত্মার সম্বন্ধে স্বপ্নদর্শনের ন্যায় মায়িকা বা মিথ্যা জানিবে। যিনি জাগ্রত-কালে বাহিরে ক্ষণিক ধর্ম্ম-বিশিষ্ট বিষয়-সমুদয় ইন্দ্রিয় দ্বারা ভোগ করেন, এবং স্বপ্নকালে হৃদয়ে জাগ্রত বাসনাময় পদার্থ সকল ভোগ করেন, তিনিই সর্ব্বাবস্থায় স্মৃতি দ্বারা আত্মানুসন্ধান করেন, এবং এই জন্যই ত্রিগুণবৃত্তির দ্রষ্টামাত্র সাক্ষীস্বরূপ হয়েন। অতএব বিচার দ্বারা গুণাধীন মনের যে তিন অবস্থা তাহা আমার মায়া দ্বারা কল্পিত জানিয়া সকল সংশয় হইতে মুক্তি লাভ কর। যতদিন এই প্রারব্ধ দেহ থাকিবে, ততদিন আমার বশতাপন্ন হইয়া প্রাণধারণ করত দেহ প্রতীক্ষা করিবে, কিন্তু স্বপ্ন-প্রবুদ্ধের ন্যায় সমাধিযোগে আরোহণপূর্ব্বক এই প্রপঞ্চ সংসারে আসক্ত হইবে না, ইহাই সাংখ্যযোগ, কিন্তু যাঁহারা আমাতে আত্ম সমর্পণ পূর্ব্বক সকল ভোগ বাসনায় নিরপেক্ষ হইয়াছেন, তাঁহাদের অপ্রাপ্য আর কিছুই নাই। আমাতে নিষ্ঠারূপ যে

দৃঢ়ভক্তি তাহা চণ্ডালকেও জাতি ও গুণ-দোষ হইতে পবিত্র করে। সত্য ও দয়া সংযুক্ত ধর্ম্মাচরণ বা তপস্যাযুক্ত বিদ্যা ভক্তিবিহীন আত্মাকে সম্যক্ প্রকারে কৃতার্থ ও পবিত্র করিতে পারে না। ভক্তিই চিত্তকে শুদ্ধ এবং দ্রব করে, তাই আমার ভক্ত আমার শ্রবণ, কীর্ত্তন ও মননে গদগদ বাক্য এবং দ্রবীভূতচিত্ত হইয়া কখন হাস্য, কখন রোদন করেন এবং ভয় ও লজ্জাশূন্য হইয়া আমার গুণগান ও আমার নামে নৃত্যাদি দ্বারা জগৎকে পবিত্র করেন। হে উদ্ধব! যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যা নিবৃত্ত হইলে আপনার প্রাপ্তি হইতে পারে, তবে কি নিমিত্ত ভক্তিযোগ কহিতেছেন তাহার কারণ বলি শ্রবণ কর। জ্ঞান চিত্তের মদাকার পরিণাম বিশেষ। ফল স্বভাবতঃ পরিপক্ক হইলেই মিষ্ট হয়, কিন্তু তাহাকে যদি অস্বাভাবিকরূপে পাকান হয়, তবে সেরূপ সুমিষ্ট হয় না। সেইরূপ কঠোর তপস্যাদি দ্বারা জ্ঞান লাভ হয় বটে, কিন্তু তাহাতে সরসতা থাকে না। ভক্তিই জ্ঞান ও রসের একাকারত্ব। হে উদ্ধব! তুমি আমার একান্ত অনুগত, তাই যতক্ষণ না তোমার সংশয় দূর হইয়া আমাতে দৃঢ় ভক্তির সঞ্চার হয়, ততক্ষণ আমি তোমাকে উপদেশ দিতে নিরস্ত হইব না। সাংখ্যাদি যোগ শাস্ত্র, বেদাধ্যয়ন, দান, তপস্যা ইহারা ধর্ম্মাঙ্গ হইলেও চিত্তকে পবিত্র ও আমাতে দ্রবীভূত করিতে সমর্থ হয় না। সেই জন্যই বলি তুমি অনন্যকর্ম্মা ও অনন্যধর্ম্মা হইয়া আমাকে ভক্তি কর, এক আমার ভক্তিতে তোমার সর্ব্বসিদ্ধি হইবে। আমার ভক্ত আর কোন সিদ্ধি চাহেন না, কেবল আমাতেই প্রীত হইতে চাহেন। আমি আমার ভক্তের বাসনা কখন অপূর্ণ রাখি না। ভক্তের প্রীতিতে আমি প্রীত হই, ভক্ত খাইলে আমি খাই, ভক্ত দেখিলে আমিই দেখি, ভক্ত শুনিলে আমিই শুনি, এবং ভক্তের আহার বিহার সকলি আমার জন্য। আমার মায়া, আমার লীলা ভক্ত ভিন্ন আর কেহই ধারণা করিতে সক্ষম নহে। আমি ভক্তের দাস, আমি ভক্তের সখা, আমি ভক্তের পুত্র ও পরিবার, আমি ভক্তের দেহ, মন, প্রাণ সকলি। ভক্তের সকল ভারই আমি বহন করিয়া থাকি। ভক্তেরই জন্য আমি সংসারে অবতীর্ণ আছি।

ভক্তকবি তুলসীদাস।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

চৈতন্য ও তুলসী উভয়ের উদ্দেশ্য অভিন্ন হইলেও, তুলসীর কার্য্যক্ষেত্র অধিকতর বিস্তীর্ণ। মহাপ্রভু বঙ্গদেশীয়, তাঁহার সাধন-ভজনাদি সমস্তই বঙ্গভাষায় সম্পন্ন হইত। এজন্য, বঙ্গভাষায় অনভিজ্ঞ হিন্দুস্থানীয় লোকেরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সে সকলের

রসাস্বাদনে বঞ্চিত ছিল। বিশেষতঃ হিন্দুস্থানীয়েরা স্বভাবতঃ কঠোরপ্রাণ, উদ্ধতস্বভাব; কোমলপ্রকৃতি বঙ্গবাসীর ন্যায় তাহারা সহজে নত হইবার নহে। চিরন্তন বিশ্বাস হইতে তাহাদিগকে বিচলিত করা সহজসাধ্য নহে। কঠিন কাচকে ভেদ করিতে যেমন হীরকই সক্ষম, হিন্দুস্থানীয়ের কঠোর হৃদয়কে ভগবৎপ্রেমে দ্রবীভূত করিতে তেমনি তুলসীই সক্ষম ছিলেন। নিষ্ঠুরতম হিন্দুস্থানীয় দস্যুরাও, তুলসীর সঙ্ঘর্ষে আসিবামাত্র ভিন্ন মূর্ত্তি ধারন করিত। তুলসীর প্রভাবে দস্যুরা শপথ পূর্ব্বক দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া সাধুজীবিকা অবলম্বন করিয়াছে, এরূপ ঘটনা তুলসী-জীবনে অনেকবার ঘটিয়াছে। বঙ্গদেশ অপেক্ষা হিন্দুস্থানের আয়তন ও লোকসংখ্যা অনেক অধিক। স্বল্পকালেই ঐ বিশাল জনপদমধ্যে তুলসীর প্রভাব এরূপ বিস্তৃত হইয়াছিল, যে, দিল্লীশ্বর হইতে কুটীরবাসী পর্য্যন্ত সকলে তুলসীর দর্শন লাভ করিলে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিত। জগতে যত প্রকার শক্তি আছে, ভক্তির শক্তির নিকট সকলেই অবনত। ভক্তবৎসল ভগবানের আকর্ষণ অপেক্ষা ভক্তের আকর্ষণ অধিক। দেখ! চন্দ্রসূর্য্যগ্রহতারাদিসমন্বিত অনন্ত বিশ্বমণ্ডলকে যিনি আত্মমধ্যে আকর্ষণ করেন, সেই বিরাট্ বিশ্বনাথও ভক্তের অকর্ষণে চালিত হন। গোকুলে শ্রীকৃষ্ণকে সরলা গোপবালার প্রেমে আকৃষ্ট দেখিয়া নারদ বলিতেছেন;—

"যস্য তনূরুহকুহরে
নটনং ব্রহ্মাণ্ডকোটীনাম্।
তমিমং গোপকৃশাঙ্গী
লোচনভঙ্গী বিঘূর্ণয়তি॥"

—যাঁহার প্রত্যেক লোমকূপের ভিতর,
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিছে নিরন্তর;
কৃশাঙ্গী গোপের বালা দেখ! বারেবারে,
নয়নের ভঙ্গীমাত্রে ঘুরাইছে তাঁরে!

সুদীর্ঘকালব্যাপী কঠোর সাধনা ভিন্ন দুরবগাহ জ্ঞানমার্গে সিদ্ধিলাভ সম্ভাবিত নহে। কলিযুগের মানবেরা দুর্ব্বল ও স্বল্পায়ু, বহুকালসাধ্য সুদীর্ঘ তপস্যায় অশক্ত। কলি মানবের পক্ষে সুগম, সুখসেব্য ও আশু ফলপ্রদ ভক্তিমার্গই ভগবানের অভিপ্রেত। এ বিষয়ে ব্যাসদেবের সহিত মহর্ষিগণের সংবাদ এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

ঘোর তামসযুগ কলিকালের আগমনে ভীত হইয়া, নৈমিষারণ্যবাসী লোকহিতৈষী মহর্ষিগণ সমবেত হইলেন, এবং কি উপায়ে লোকের পরিত্রাণ হইবে তদ্বিষয়ে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিবার জন্য তাঁহারা ত্রিকালদর্শী, সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ, ভগবান্ বেদব্যাসের নিকট গমন করিলেন। বেদব্যাস তখন স্নানার্থ জাহ্নবীর সলিলে অবতরণ করিয়াছেন দেখিয়া, ঋষিমণ্ডলী তীরে দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ব্যাসদেব অবগাহনকালে,—"কলিঃ সাধুঃ" —এই বাক্য তিনবার উচ্চারণ করিলেন। তিনি স্নান করিয়া উঠিলে, ঋষিগণ তাঁহাকে

অভিবাদন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন ;— "ভগবন্! ঘোর তামসযুগ উপস্থিত ; আমরা ভীত হইয়া আপনার নিকট আসিলাম। এখন হইতে লোকের পরমায়ু ও শক্তি সংক্ষিপ্ত হইতে চলিল। সাঙ্গ বেদাধ্যয়ন, কঠোর তপস্যা, অশ্বমেধাদি মহাযজ্ঞ, গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত, এ সকল সাধনা কলিমানবের পক্ষে কি সম্ভব ? এক্ষণে কর্ত্তব্য কি, জানিবার জন্য আপনার শরণাপন্ন হইলাম ; উপায় নির্দ্দেশ করিয়া আমাদের ভয়ভঞ্জন করুন।" সর্ব্বার্থদর্শী মহর্ষি দ্বৈপায়ন ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন ;— তোমাদের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়াই আমি "কলিঃ সাধুঃ" বলিয়াছিলাম। কলিযুগের উপর ভগবানের বড় দয়া। এ যুগের মানবেরা দুষ্কর তপস্যাদিসাধনে অশক্ত হইবে জানিয়া, করুণাময় হরি সকলের মুক্তিলাভের জন্য অতি সুখসেব্য ভক্তিমার্গের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পুত্রবৎসল মাতা পিতা যেমন নিজ সন্তানের কল্যাণচিন্তায় নিযুক্ত, করুণাময় নারায়ণ তেমনি সর্ব্বজীবের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত। তাঁহার সৃষ্ট জীবগণের পক্ষে যখন যাহা আবশ্যক, অন্যের ভাবিবার পূর্ব্বেই তিনি তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখেন। এখন হইতে মানবেরা ভগবানকে স্মরণ করিলে, তাঁহার নাম ও কথার আলাপ করিলে, সর্ব্বপাপনির্ম্মুক্ত হইয়া ভবসাগর উত্তীর্ণ হইবে। (১)

"কলিকল্মষমত্যুগ্রং নরকার্ত্তিপ্রদং নৃণাম্।
প্রয়াতি বিলয়ং সদ্যো হরিস্মরণমাত্রতঃ॥"
(বিষ্ণুপুরাণ)

—মানবেরা হরিস্মরণমাত্রেই, নরকযাতনাকর, অতিভীষণ কলিকলুষরাশি হইতে পরিত্রাণ পাইবে।

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং
কল্মষাপহং।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে
ভূরিদা জনাঃ॥"
(ভাগবত)

—হরি হে! আতপ-তাপিতের পক্ষে যেমন সুশীতল পানীয়, ভবতাপদগ্ধের পক্ষে তেমনি তোমার কথালাপ—অপূর্ব্ব অমৃত! এ অমৃতের নামমাত্রেই সর্ব্বতাপের শান্তি। যাঁহারা স্বর্গমোক্ষকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছেন, সেই শুক নারদাদি জীবন্মুক্ত যোগীরাও তোমার কথামৃত সাদরে পান করিয়া থাকেন, পুলকিত গাত্রে মুক্তকণ্ঠে এ অমৃতের গুণকীর্ত্তন করেন। যাঁহারা জীবলোককে এ অমৃত দান করেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ দাতা—তাঁহারাই জীবলোকের জীবনদাতা।—ফলতঃ ভগবৎকথার ন্যায় সর্ব্বতাপহারিণী—পতিতপাবনী—মৃতসঞ্জীবনী—সর্ব্বজীবসেব্য সুধা আর কি আছে, জানি না। হা মানব! তোমার গৃহমধ্যেই অমূল্যনিধি চিন্তামণিধন

১। "কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥"
শুকদেব পরীক্ষিৎকে কহিতেছেন,—হে রাজন্! কলি সকলদোষের আধার হইলেও, ইহার একটী মহৎ গুণ এই যে, এ কালের লোক হরিকীর্ত্তনেই ভববন্ধনমুক্ত হইয়া পরম পদ লাভ করে।
(ভাগবত, ১২ স্কন্ধ, ৩ অধ্যায়, ৫১)

বিদ্যমান, তুমি সে ধন ছাড়িয়া তুচ্ছ কাচের আশায় ঘুরিয়া মরিতেছ! হায় রে!—

"জন্মেদং ব্যর্থতাং নীতং ভবভোগোপলিপ্সয়া।
কাচমূল্যেন বিক্রীতো হন্ত চিন্তামণির্ময়া॥"
—বিষয়তৃষ্ণায় বৃথা গেল রে জীবন,
বেচিনু কাচের মূল্যে চিন্তামণিধন।

ভক্তিমার্গের ন্যায় ভগবৎকৃপালাভের এমন মধুর, এমন প্রাণারাম উপায় আর নাই। দর্শনমীমাংসাদি-প্রতিপাদ্য জ্ঞানকাণ্ড ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় হইলেও, ঐ সকল শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া সাররত্ন সঙ্কলন করা অল্প সাধনার কার্য্য নহে। দর্শনাদি শাস্ত্র মতভেদে ও তার্কিকতায় এরূপ জটিল ও দুর্ভেদ্য যে, অসামান্যধীসম্পন্ন মনীষিগণও যাবজ্জীবন প্রয়াস পাইয়া প্রকৃততত্ত্বে উপনীত হইতে পারেন না। ঐ সকল তর্কব্যূহ ভেদ করিয়া যিনি প্রকৃত সত্যে উপনীত হইয়াছেন, তিনি ভাগ্যবান্ সন্দেহ নাই। কিন্তু ভক্তিমার্গে সিদ্ধিলাভ করিতে অসামান্য জ্ঞান, বিজ্ঞান, বুদ্ধি বা বিচারশক্তির প্রয়োজন হয় না। আত্মশোষণাদি কঠোরতার প্রয়োজন নাই। সুদীর্ঘ তপঃসাধনের প্রয়োজন নাই। সাধুসঙ্গে পরমানন্দে স্বল্পকালেই ভবরোগের শান্তি হয়। কটু-তিক্ত কষায় ঔষধে ও উপবাসে সুদীর্ঘকালে যে ব্যাধির শান্তি হয়, সেই ব্যাধি যদি সুপেয় শর্করাসলিল সেবন দ্বারা অচিরেই নিবারিত হয়, তবে কাহার না শর্করাসলিলে আগ্রহ হয়?

ভক্তির এমনি প্রভাব, এমনি মহিমা, যে, হৃদয়ে ভাবাবেশ হইবামাত্র, অমৃতরসে সর্ব্বেন্দ্রিয় প্লাবিত হয়, প্রেমানন্দধারা শিরায় শিরায় লহরে লহরে ছুটিতে থাকে। সে তরঙ্গে পাপ তাপ, রোগ শোক, জরা-মৃত্যু, ভয়োৎকণ্ঠা তৃণরাশির ন্যায় ভাসিয়া যায়, মানব ভূলোকে থাকিয়াও দেবদুর্লভ চিদানন্দ সম্ভোগ করে।

তুলসী ভক্তিযোগে সিদ্ধি। ভক্তির স্বরূপ ও প্রভাব আত্মায় প্রত্যক্ষ করিয়া, স্বয়ং আত্মানন্দ উপভোগ করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না। তাপদগ্ধ জীবলোককে সে আনন্দ দান করাই তাঁহার মুখ্য ব্রত ছিল। স্বকৃত ভক্তিগ্রন্থ বিতরণ তাঁহার একটী প্রধান কার্য্য ছিল। স্বকৃত রামায়ণাদি গ্রন্থের বহুসংখ্যক হস্তলিপি তিনি স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া বিতরণ করেন। তাঁহার হস্তলিখিত রামায়ণ ও বিনয়পত্রিকা (১) প্রভৃতি গ্রন্থ বহুতর দেবালয়ে, মঠে ও ভক্তগৃহে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ভক্তগণ কর্ত্তৃক বংশপরম্পরাক্রমে ঐ সকল পুঁথি ধূপ-দীপ-পুষ্প-চন্দন-তুলসী-নৈবেদ্যাদি বিবিধ উপচারে পূজিত হইয়া থাকে। তাঁহার ভক্তেরাও তৎকালে তদীয় গ্রন্থ ও দোঁহাবলীর বহুসংখ্যক হস্তলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তৎকালে মুদ্রাযন্ত্র না থাকিলেও, ঐ সকল হস্তলিপি দ্বারা তদীয় গ্রন্থাবলীর প্রচার হইয়াছিল। তাঁহার সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ রামায়ণ বিষয়ে নানা কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। কথিত আছে, তাঁহার রামায়ণ রচনাকালে স্বয়ং হনুমান

(১) তুলসীকৃত গ্রন্থাবলীর নাম ও প্রতিপাদ্য সহ তালিকা পশ্চাৎ প্রদত্ত হইবে।

আবির্ভূত হইয়া, সময়ে সময়ে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। এরূপ প্রবাদ যে,—হনুমান্ স্বয়ং সমগ্র রামায়ণ রচনা করিয়া, তাহা নখ দ্বারা শিলাগাত্রে খোদিত করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি তুলসীর রামায়ণ দেখিয়া, স্বরচিত রামায়ণকে অকিঞ্চিৎকর ভাবিয়া তাহা বিনষ্ট করেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সময়ে, চিত্রকূটে রামায়ণের শ্লোকাঙ্কিত অনেকগুলি শিলাখণ্ড সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ সকল শিলা-লিপিগুলি কালজীর্ণ, ক্ষতবিক্ষত ও লুপ্তপ্রায় হওয়ায়, তাহার পুনরুদ্ধার হয় নাই। অধুনা তুলসী-রামায়ণের যে সকল হস্তলিপি বিদ্যমান আছে, তাহার কোনও কোনও পুঁথিতে নিম্নলিখিত শ্লোক দৃষ্ট হয়;—

"কলৌ সর্ব্বজনৈঃ সেব্যং রামব্রহ্মকথাশ্রয়ম্।
ভাষারামায়ণং বেদং চকার তুলসী বিভুঃ॥"

—কলিযুগে প্রভু তুলসীদাস, রামরূপী ব্রহ্মের চরিত্রকথাকে সর্ব্বসাধারণের সেবনীয় করিবার জন্য দেশী ভাষায় রামায়ণ রচনা করিয়াছেন।

তুলসীর স্বহস্তলিখিত স্বকৃত রামায়ণের কিয়দংশ অদ্যাপি তদীয় জন্মস্থানে রক্ষিত আছে। বান্দাজেলায়, রাজাপুর গ্রাম তুলসীর জন্মস্থান। তদীয় ভদ্রাসন যমুনা-কূলে উচ্চমৃত্তিকাস্তূপে স্থাপিত। তাঁহার সময়ে গঙ্গাও ঐ স্থানে প্রবাহিতা ছিল। কিন্তু কালবশে গঙ্গা সে স্থান হইতে বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে। যে যে স্থানে গঙ্গা ও যমুনার সম্মিলন হয়, সেই সেই স্থানকে "অন্তর্ব্বেদি" বলে। অন্তর্ব্বেদি অতি পবিত্র তীর্থ মধ্যে পরিগণিত। শ্রীকৃষ্ণদাস ভক্ত প্রভৃতি প্রাচীন ভক্তিগ্রন্থকারেরা তুলসীর জন্মস্থানকে "অন্তর্ব্বেদ" নামে অভিহিত করিয়াছেন। তুলসীর জন্মস্থানে তদ্বংশীয়েরা অদ্যাপি বাস করিতেছেন। ঐ স্থানে তুলসীর প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়; মূর্ত্তিটী অতি প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়। এইরূপ জনশ্রুতি যে, ঐ স্থানে কোনও মন্দিরমধ্যে তুলসীর স্বহস্তলিখিত তৎকৃত সমগ্র রামায়ণ রক্ষিত ছিল। কোনও ব্রহ্মচারী ঐ রামায়ণপুঁথি হরণ পূর্ব্বক পলায়ন করেন। স্থানীয় লোকেরা ঐ সংবাদ পাইয়া পুস্তকাপহারীর অনুসরণ করায়, তিনি পুঁথিখানি যমুনাজলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক পলায়ন করেন। লোকেরা নানা উপায়ে জলমধ্যে বিস্তর অনুসন্ধান করিয়া ঐ রামায়ণের এক কাণ্ড মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঐ কাণ্ডখানি তত্রত্য জমিদারের গৃহে অদ্যাপি রক্ষিত আছে। তুলসীর হস্তাক্ষরদর্শনার্থী হইয়া অনেকে ঐ স্থানে গিয়া উহা দর্শন করিয়া থাকেন। তুলসীর হস্তলিপির প্রতিলিপি লইবার জন্য অনেকে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু উহার প্রতিলিপি লইতে দেওয়া হয় না। দর্শকেরা কেবল উহা দর্শন, পূজা ও নমস্কার করিয়া আসেন।

"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।" যিনি এই মর্ত্তলোকে আসিয়া নশ্বর ভৌতিক দেহ দিয়া অনশ্বর, অভৌতিক যশোরাশি সঞ্চয় করিয়া যান, তিনিই অমর। কতকাল হইল, তুলসীর সেই ভৌতিক কলেবর পঞ্চভূতে লয় পাইয়াছে, কিন্তু নানা স্থানে তদীয়

অগণ্য পুণ্যচিহ্ন তাঁহার স্মৃতি ও কীর্ত্তির সাক্ষ্য দিতেছে। নানা দেশ পর্য্যটনকালে তিনি কত স্থানে যে কত কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার সংখ্যা হয় না। তাঁহার বহুতর কীর্ত্তিচিহ্ন কালগর্ভে বিলীন হইলেও, অদ্যাপি যাহা বর্ত্তমান আছে, তদ্দ্বারা তদীয় মহিমার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। অলৌকিক সাধুগণের আকৃতি তাঁহাদের গুণানুরূপিণী হয়। তাঁহার শান্ত, পাবন, অভয় মূর্ত্তি দেখিয়া, শোকময়, রুগ্ন, বিপন্ন জনগণ আশায় ও উল্লাসে উৎফুল্ল হইত। "যত্রাকৃতিস্তত্র গুণা বসন্তি"— এ মহাজনবাক্য সত্য। অলৌকিক পুণ্যপ্রভাবে যাঁহারা জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন, সেই বুদ্ধ-খৃষ্ট-চৈতন্য প্রভৃতি সকলেই অলৌকিকমূর্ত্তি-সম্পন্ন। যাঁহার শক্তিপ্রভাবে আমেরিকা, ইংলণ্ডের দাসত্ব-শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া, উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে, সেই বিশ্ববিখ্যাত মহাত্মা জর্জ্জ ওয়াসিংটন গুণানুরূপ মূর্ত্তিসম্পন্ন ছিলেন। কবিবর ড্রাইডেন্ তাঁহার মূর্ত্তি বিষয়ে লিখিয়াছেন ;—

"Mark his majestic fabric! He's a temple
Sacred by birth, and built by hands divine;
His soul's the deity that lodges there; Nor is the pile unworthy of God."

—ওহো! উঁহার প্রভাবশালিনী মূর্ত্তি লক্ষ্য কর! উনি আজন্মশুদ্ধ একটী দেবমন্দির; ও মন্দিরটী ঈশ্বর স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়াছেন; ও দেহমন্দিরে উঁহার আত্মারূপ দেবতা প্রতিষ্ঠিত।

সর্ব্বসৌন্দর্য্যনিধি ঈশ্বর যাহাকে কৃপা করেন, তাহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরই করেন, তাহার কোন দিকে কোনও ত্রুটি রাখেন না।

(ক্রমশঃ)

দাগীচোর।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

কিন্তু এইবার সেই চিরপ্রসন্ন সদানন্দময় মুখে কালিমার সঞ্চার দেখিয়া আমার বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। খোকা যে তাঁহার কত প্রিয়, আগে বুঝি আমিও তাহা অনুভব করিতে পারি নাই। খোকার অসুখের অল্পদিন পরেই প্রাইভেট পড়ান ছাড়িয়া দিয়াছেন, চৌধুরীদের আড্ডাতে আর মাসান্তেও যাইতে পারেন না, কেবল আপিসের সময় দায়গ্রস্তের মত আপিসে যান, আর সারা দিনরাত্রি কেবল খোকাকে নিয়াই থাকেন। খোকার সেবা শুশ্রূষা করিতে করিতে আমিও অনেক সময় ক্লান্তি বোধ করিয়াছি, তাহার কান্না শুনিতে শুনিতে আমিও অনেক সময় ত্যক্ত হইয়াছি, কিন্তু তাঁহার শ্রান্তি, ক্লান্তি, অবসাদ বা বিরক্তি কদাচ দেখিতে পাই নাই। কিসে খোকা একটু ভাল থাকিবে,— কিসে তার মন একটু প্রফুল্ল হইবে, কেমন

করিলে যে একটু ঘুমাইবে, অবিরাম কেবল সেই চেষ্টা!

যে ভাল হয়, ভগবান্ বুঝি তার সবই ভাল করেন, নতুবা যাঁর তীব্র শ্লেষবাক্য ও পরিহাসরসিকতাপূর্ণ গল্প শুনিয়া লোকে মোহিত হইত, যাঁর তাস, পাশা, দাবা-খেলায় একান্ত একাগ্রতাদর্শনে লোকে অবাক্ হইত,—যাঁহার মুখে পরের প্রশংসা ভিন্ন পরের নিন্দা কেহ কখনও শুনিতে পায় নাই,—যাঁহার মুখে মৃদু হাস্য ভিন্ন ঘৃণা বিরক্তির চিহ্নমাত্র কেহ লক্ষ্য করিতে পারে নাই,—আজকাল তাঁহাকেই এমন সব ফেলিয়া, কেবল ছেলের সেবা শুশ্রূষায় নিরন্তর নিযুক্ত দর্শনে সকলে মুগ্ধ হইতেছে! তাঁহার শত্রু বোধ হয় জন্মায় নাই,—তাঁহার অনিষ্টকামনা বোধ হয় কাহারও মনে স্থান পায় না। যে একবার তাঁহার সঙ্গে মিশিয়াছে, সেই তাঁহার চিরবন্ধু হইয়াছে। আমরা যদিও দরিদ্র, তবু কেবল তাঁহারই গুণে, ছোট বড় সকলেই আমাদিগকে স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

—কি লিখিব ছাই,—সব কথাতেই কেবল উঁহার কথা আসিয়া পড়ে! তাই খোকার কথাও ভাল করিয়া বলিতে পারিতেছি না,—আমি যেন তাঁহাতেই ডুবিয়া গিয়াছি,—তাই যে দিকে তাকাই, যে কথা ভাবি, তাহাতেই কেবল উঁহার কথা মনে পড়ে!

এতদিন তিনি রোজগার করা ভিন্ন, খরচ পত্র, দেনা পাওনা, সঞ্চয় কিছুরই ধার ধারিতেন না। আমিও আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতটুকু পারি আমাদের ক্ষুদ্রসংসারের কাজ এক রকমে নির্ব্বাহ করিতাম, কদাচ তাঁহাকে অকারণ সে সব ঝঞ্ঝাটে ফেলিতাম না, কিন্তু এতদিন পরে, আজ তাঁহার মুখে প্রথম শুনিলাম, "সুরমা! তোমার হাতে কি কিছু আছে? খোকাকে বুঝি বাঁচাইতে পারিলাম না! ভগবান্ কেন এই দরিদ্রের ঘরে এমন অমূল্য রত্ন দিয়া আবার ফিরাইয়া নিতে চাহিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারি না!" আমি অভাগিনী, কি লিখিব,—চাহিয়া দেখিলাম সেই চির-হাস্যময় মুখচন্দ্র মলিন,—সেই নীলিমনয়ন বহিয়া জল পড়িতেছে! যাতনায় আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল,—মনে মনে ভগবান্‌কে বলিলাম, "হে ভগবান্! কি দিলে আবার সেই দিন ফিরিয়া পাওয়া যায়?—আমার পরমায়ু, আমার স্বাস্থ্য, আমার সর্ব্বস্ব লইয়াও যদি খোকাকে রক্ষা করা যায়, তবে হে দীনহীনের দেবতা! তুমি তাই কর,—তুমি তাই কর,—আবার আমাদের ক্ষুদ্র কুটীরে সেই সুখের দিনগুলি ফিরিয়া আসুক!" কিন্তু দেবতা এই অভাগিনীর প্রার্থনা শুনিলেন না,—খোকা দিন দিনই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল।

৩

অবশেষে আমার হাতের বালা ও উঁহার পুরস্কার পাওয়া সোণার মেডেল ও সোণার ঘড়ি, চেইন বন্ধক দিয়া ২০০৲ দুই শত টাকার সংস্থান করিয়া গিরিডি যাওয়া স্থির করিলাম। সংসারে আর আমাদের কেহ

ছিল না, শুধু বুড়ী ঝি হরিমতি এবং গোয়ালে দুইটী দুগ্ধবতী গাভী। গাভী দুইটী এবং সামান্য তৈজস পত্রাদি যাহা ছিল, তাহা চৌধুরীদের বাড়ী রাখিয়া, দুয়ারে তালা দিলাম, এবং কার্ত্তিক মাসের প্রথম সপ্তাহে আমরা গিরিডি যাত্রা করিলাম। হরিমতিও আমাদের সঙ্গে চলিল।

নন্দ বাবুকে আগেই চিঠি লেখা হইয়াছিল, তিনি আমাদের জন্য মধুপুরে আসিয়া অপেক্ষা করিতে ছিলেন। ভোর হয় হয় সময় আমরা মধুপুরে অবতীর্ণ হইলাম, এবং ষ্টেশনের কলের জলে হাত মুখ ধুইয়া ৭ টার সময় গিরিডির ব্রাঞ্চ লাইনের গাড়ীতে উঠিলাম। ১০ টার আগেই আমরা নন্দবাবুর বাসায় উপস্থিত হইলাম।

নন্দবাবুর স্ত্রী কমলা ও আমি মিস্‌নীদের বোর্ডিং স্কুলে একত্র পড়িতাম—বিবাহের পর আর দুজনে দেখা হয় নাই। তবে চিঠি পত্র লেখা চলিত বটে। অনেক দিনের পর সাক্ষাতে দুজনেই বড় আনন্দিত হইলাম,—কিন্তু খোকার অবস্থা দর্শনে কমলাও যেন একটু দমিয়া গেল।

কমলার ২টী মেয়ে, বড়টীর বয়স ৩ বৎসর, আমাদের খোকার ৪ বৎসরের ছোট, অপর কন্যাটী কোলে। মেয়ে দুটী যেন পরীর মত সুন্দরী। নন্দবাবু নিজে সুপুরুষ, কমলা ত বিদ্যালয়ে তাহার শারীরিক সৌন্দর্য্যের জন্য বিখ্যাতই ছিল, সুতরাং তাঁহাদের কন্যা দুইটী যে সুন্দরী হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? নন্দবাবু গিরিডিতে এক দোকান করিয়া বার মাস তথায় বাস করেন, দোকানের আয়েই তাঁহার স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়। প্রতি বৎসর পূজার সময় একবার তিনি বাড়ী যান, এবার তাহাও ঘটিয়া উঠে নাই। আমাদের মত তাঁহারও দেশে কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় নাই, সে জন্য দেশের প্রতি তাঁহার মমতাও কম। আমার স্বামীর তিনি বাল্যবন্ধু, এবং সেই সম্পর্কেই আমরা নন্দবাবুর বাসায় উঠিয়াছি। তাঁহার বাসাটী "বরাকরের" পারে একটী অতি সুন্দর উচ্চ ভূমিতে শালবনের পার্শ্বে অবস্থিত। বরাকরের তলদেশে রজতরেখার ন্যায় সামান্য একটু জল তরতর বেগে বহিয়া যাইতেছে, দুধারে বালুকাময় চড়া। অপর পারে বড় সুন্দর সবুজ ধান্য জন্মিয়াছে, যতদূর দৃষ্টি চলে কেবল ধান, যেন কে একখানা সবুজ বর্ণের গালিচা দেশময় পাতিয়া রাখিয়াছে! দূরে দূরে কত ছোট বড় পাহাড়। স্থানে স্থানে কয়লার খনিতে কাজ হইতেছে,—চিম্‌নী হইতে ধুম বাহির হইতেছে,—ছোট ছোট ইঞ্জিনগুলি কয়লা টানিয়া লইয়া যাইতেছে,—বাসায় দাঁড়াইয়া এ সব পরিষ্কার দেখা যায়। যদি খোকার অসুখ না থাকিত, তবে বোধ হয় এমন সুন্দর স্থানে আসিয়া আমরা দু জনে কত সুখী হইতাম,—কিন্তু খোকার অসুখে কিছুতেই আমাদের মনে আনন্দ হইতে ছিল না। এক এক সময় আমার আপনা আপনি কান্না আসিত,—সংসার যেন অসার মনে হইত, আবার বহু কষ্টে,

খোকার অকল্যাণ হইবে ভাবিয়া সে অশ্রু রোধ করিতাম।

কমলাদের বাসায় ৪ খানা ঘর, খোলার চাল, ভিত্তি পাকা। তাহারই একখানায় আমাদের স্থান হইল। হরিমতি কোন দিন আমাদের সাঁওতালী ঝি "নীলখিয়া"র সঙ্গে শুইত, আবার খোকার অসুখ বৃদ্ধি পাইলে এক এক দিন আমাদের ঘরেও থাকিত। আমরা কমলাদের সঙ্গে একত্র আহার করিতাম,—দুই বেলাই দু জনে এক সঙ্গে গল্প করিতে করিতে রান্না করিতাম,—আর গৃহান্তরে উনি নন্দবাবুর সঙ্গে দাবা, পাশার শ্রাদ্ধ করিতেন।

প্রাতঃহ সকালে হাত মুখ ধুইবার পর, এবং বিকালে সন্ধ্যার একটু আগে আমরা শালবনে ও "বরাকরের" বালুচরে কিয়ৎকাল হাঁটিয়া বেড়াইতাম। নিকটবর্ত্তী আরও অনেক বাসা হইতে অনেক মেয়ে ছেলে আসিয়া আমাদের সঙ্গে যোগ দিতেন। কৌতুক হাস্যে ও গল্পগুজবে সে সময় টা বড় সুখে অতিবাহিত হইত। তবু খোকার অসুখের জন্য এক একবার আমার মনটা যেন খালি খালি বোধ হইত,—এবং আমি দমিয়া পড়িতাম। খোকাও আমাদের সঙ্গে বেড়াইতে যাইত, কিন্তু বেশী দূর হাটিতে পারিত না। হরিমতি ও নীলখিয়া তাহাকে কোলে লইয়া বেড়াইত।

৪

গিরিডিতে আসিয়া প্রথম কয়দিনে খোকার শরীর যেন একটু ভাল বোধ হইল, সে একটু শক্তি পাইতে লাগিল, জ্বরও কমিয়া গেল। আমি আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হইতে লাগিলাম। উনিও বিশেষ আনন্দিত হইলেন, এবং আবার তাঁহার সেই পূর্ব্ব হাস্য যেন ধীরে ধীরে দেখা দিতে লাগিল। একদিন দেখিলাম, তিনি একটী কবিতা লিখিয়া নন্দবাবুকে শুনাইতেছেন,—কবিতাটী ছোট হইলেও তিনি যে প্রাণে অনেকটা শান্তি পাইয়াছেন, এবং চিন্তার ভার যে অনেক কমিয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। কবিতাটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

গিরিডি।

আঁধারে আলোক ফোটে যাঁর করুণায়,
যাঁর করুণায় বহে যমুনা জাহ্নবী,
পাহাড়ে এ পুষ্পবন তাঁরি মহিমায়,
চরণে প্রণাম তাঁর করে দীন কবি।
প্রকৃতি আপন করে প্রেম-তূলিকায়,
আঁকিয়া রেখেছে এই চারু চিত্রপট,
ভাসিছে শান্তির রাজ্য সৌন্দর্য্য বন্যায়,
লাবণ্যের লীলাভূমি "বরাকর" তট।
গিরিডির গিরিশৃঙ্গে দেববালাগণ,
প্রতিদিন আসে যায়, মাখিয়া চরণে,
সায়াহ্নরবির রক্ত অলক্ত-কিরণ,
ভাসে তাই চারিদিক্ কাঞ্চন বরণে।
এ সৌন্দর্য্য, এ লাবণ্য হেরি কতবার,
আনন্দে ফিরিতে চিত্ত নাহি চায় আর॥

নন্দবাবু ত কবিতাটি শুনিয়া "ওহে তোমার পেটে এত বিদ্যা ছিল, আগে ত তাহা টের পাই নাই, সাক্ষাৎ মা সরস্বতী

যেন তোমার স্কন্ধে ভর করিয়াছেন, রবি বাবু, নবীন বাবু, একার সকলেই গলায় দড়ী দিবেন!" ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া পরিহাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই শাল্মলী বৃক্ষে গাত্র ঘর্ষণ করিয়া নন্দবাবুর সহজে নিষ্কৃতি হয় নাই। "সঙ্গীতসাহিত্য-রসানভিজ্ঞ বিষাণপুচ্ছশূন্য" জন্তুবিশেষের সহিত নন্দবাবু ত উপমিত হইলেনই, অধিকন্তু কমলাও "অমন জন্তুর সঙ্গে কেমন করিয়া এতকাল একত্র বাস করিতেছে," তাহার সদুত্তর দিতে বাধ্য হইল, কারণ কমলারও একটু কবিতা লেখা রোগ ছিল।

কিন্তু আমাদের এ আনন্দ বিধাতা দীর্ঘ স্থায়ী হইতে দিলেন না, ১৫।১৬ দিন অতীত হইতে না হইতেই খোকার অসুখ আবার খুব বাড়িয়া উঠিল। কলিকাতা হইতে যে ঔষধ সঙ্গে আনা হইয়াছিল, তাহাতে কোন উপকারই হইল না। গিরিডিতে ভাল চিকিৎসক কেহ নাই, জল বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য যাহারা আসিয়া থাকেন, তাঁহাদের কেহ কেহ খোকাকে দেখিয়া ঔষধাদির ব্যবস্থা করিলেন বটে, কিন্তু গিরিডিতে টাট্‌কা ঔষধ না পাওয়াতে সে সব ব্যবস্থায়ও কোন ফল হইল না।

৫

মনে আছে, সেদিন অগ্রহায়ণ মাসের ৫ই তারিখ, শনিবার। বিকাল বেলায় একটুখানি মেঘ হইয়াছে, পাহাড় দেশে প্রায়ই এইরূপ হয়। খোকার জরটা সে দিন হঠাৎ খুব বাড়িয়া উঠিল, এবং সন্ধ্যার পর হইতেই সে অজ্ঞানবৎ প্রলাপ বকিতে লাগিল। তাহার এমন অবস্থা ইতিপূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই,—আমি যেন দশ-দিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। নন্দবাবু তাড়াতাড়ি পরেশ বসু ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিলেন। ডাক্তার বাবু খোকার নাড়ী, বক্ষ, কক্ষ, মাথা, পেট, পিঠ সব পরীক্ষা করিয়া নন্দবাবুর নিকট চুপে চুপে কি বলিয়া চলিয়া গেলেন। নন্দবাবুও গম্ভীর ভাবে গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন। আমার মনে কত যে অমঙ্গল আশঙ্কার সঞ্চার হইতে লাগিল, তাহা অন্তর্য্যামী ভগবান্‌ই জানেন!

কিছুকাল পর নন্দবাবু তাঁহার শয়নগৃহ হইতে "উপেন" "উপেন" বলিয়া ডাক দিলে উনিও উঠিয়া সেই ঘরে গেলেন। খোকার কাছে আমি, কমলা, নীলথিয়া এই তিনজনে থাকিলাম। হরিমতি তখন সকলের জন্য রান্না ঘরে রুটী প্রস্তুত করিতেছিল।

রাত্রি ১০টার পর খোকার ঘুম হইল, প্রলাপও থামিল। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে বিছানার একধারে ঘুমাইয়া পড়িলাম, কমলাও তাহার ছোট মেয়েটী লইয়া সেই খানে শুইয়া পড়িল। সে রাত্রিতে আর কাহারও আহার হইল না। হরিমতি তাহার রুটীগুলি চাপা দিয়া রাখিয়া ভূমিশয্যায় ঘুমাইয়া পড়িল। নন্দবাবুর ঘরে উনি ও পুঁটি (কমলার বড় মেয়ে অরুন্ধতীকে সকলে আদর করিয়া পুঁটি বলিয়া ডাকিত) শুইলেন।

এইভাবে কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম। ঠিক্ বলিতে পারি না। কিন্তু সহসা কি যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া অজ্ঞাত আশঙ্কায় আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঘরে সকলেই নিদ্রিত, একটা লণ্ঠনে আলো জ্বলিতেছিল। আমি খোকার গায় হাত দিতে গিয়া দেখিলাম, যে তথায় খোকা নাই কমলা নীরবে ঘুমাইতেছিল, তাহাকে জাগাইলাম না; মনে করিলাম যে আমাদের ঘুমের ঘোরে খোকা হয়ত কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, তখন উনি আসিয়া খোকাকে ঐ ঘরে তুলিয়া নিয়াছেন। তথাপি মনটা যেন কেমন করিতে লাগিল, সেজন্য হরিমতিকে বলিলাম, "বাবুকে ডাকিয়া দে।" তিনি দুয়ারের কাছে আসিয়া, "কি খোকা এখন কেমন আছে?" জিজ্ঞাসা করিলে, আমি "ও কেমন রঙ্গ, নিজে আসিয়া কখন খোকাকে নিয়াছ, তবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ যে খোকা কেমন আছে?" বলিবামাত্র উনি "সে কি কথা?" বলিয়া ব্যস্ত ভাবে একবারে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমি দ্রুত হস্তে কমলের গায়ের কাপড় ঠিক করিয়া তাহাকে তুলিয়া দিলাম। গোলমাল শুনিয়া নন্দবাবুও দৌড়িয়া আমাদের ঘরে প্রবেশ করিলেন। সকলেই আছে, কেবল খোকা নাই! ব্রহ্মাণ্ডও যেন ঘুরিতে লাগিল, আমার পায়ের নীচ হইতে পৃথিবী যেন সরিয়া যাইতে লাগিল। আমি পাগলিনীর ন্যায় একবার কমলের গলা জড়াইয়া, একবার উঁহার হাতে, আবার নন্দবাবুর পায় ধরিয়া "ওগো! আমার খোকাকে আনিয়া দেও," বলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। হরিমতিও ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। নন্দবাবু তাড়াতাড়ি লণ্ঠন লইয়া চারিদিকে খুজিতে লাগিলেন, এবং কিয়ংকাল পরে আসিয়া বলিলেন, "নীলখিয়া কোথায়? তাহাকেও ত দেখিতে পাইতেছি না।"

নীলখিয়ার অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে খোকার নিরুদ্দেশের সম্বন্ধ বুঝিতে বিলম্ব হইল না। খোকার গলায় একছড়া সোণার সরু হার ও কয়েকটী সোণার মাদুলী ছিল। ঘরে সেই হার ও মাদুলী খুলিতে গেলে পাছে খোকা কাঁদিয়া উঠে, সেই ভয়েই যে নীলখিয়া আমার বাছাকে লইয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। আমি আর মনকে প্রবোধ দিতে পারিলাম না। বিশ্বসংসার যেন আমার নিকট ডিমের খোসার মত শূন্যময় বোধ হইতে লাগিল! হায়! হায়! কেন আমি বাছাকে লইয়া গিরিডি আসিয়াছিলাম, কোথা হইতেইবা কাল নিদ্রা আসিয়া সেদিন আমার চক্ষে ভর করিয়াছিল! আহা! আমার বাছাকে কি আর ডাকিনী এখনও জীবিত রাখিয়াছে। হয়ত শীতের মধ্যে কোন্ শালবনে নীলখিয়া তাহাকে ফেলিয়া গিয়াছে, আর আমার অঞ্চলের নিধি তথায়,—না,—আর ভাবিতেও পারি না!

৬

সাত দিন অতীত হইয়াছে, আমার বাছার বা নীলখিয়ার কোন সন্ধানই পওয়া

যায় নাই। পুলিশে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল, চতুর্দ্দিকে যত ভদ্রলোক জল বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য আগত হইয়াছেন, তাঁহারাও নানাদিকে বহু দূর পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। বাজারে যত সাঁওতাল কুল বেচিতে, কাঠ বেচিতে, তরকারী বেচিতে বা অপরাপর কারণে যাতায়াত করে, তাহাদের সকলকে নানা প্রকারে জিজ্ঞাসা করা হইল, কিন্তু কেহই নীলখিয়া বা খোকার কথা কিছুই জানা স্বীকার করিল না। নীলখিয়ার কোন বাড়ী ঘর আছে কিনা, তাহা কেহই বলিতে পারে না। সে নন্দবাবুর সংসারে বহুদিন যাবৎ চাকরাণীর কাজ করে, সেই খানেই খায়, সেই খানেই থাকে। চাকরী লইবার পর সে কখনও কোথায় যায় নাই। তাহার আর কে আছে, এবং তাহার বাড়ী ঘর কোথায় তাহা নন্দবাবু বা কমলা কখনও ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করেন নাই, নীলখিয়াও সে কথা কখন বলে নাই।

সাতদিন অতীত হইল, খোকার কোন সন্ধানই মিলিল না। আর কি করিতে গিরিডিতে থাকিব? আর কার জন্য গিরিডিতে থাকিব? গিরিডিতে বাস করা অসহনীয় হইয়া উঠিল, অথচ মনকে প্রবোধও দিতে পারি না। খোকাকে যে আর ইহজন্মে পাইব না, এ কথা কিছুতেই মনকে যেন বুঝাইতে পারি না। মনে হয় যেন, বাছা আমার নিকটেই কোথায় আছে, একদিন হঠাৎ তাহার সঙ্গে দেখা হইবে! আমি যেন চিন্তায় আত্মহারা হইতে লাগিলাম। অবশেষে আমার স্বামীর আগ্রহাতিশয্যে হরিমতিকে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া যাওয়াই স্থির হইল। হায়! কি লইয়া আসিয়াছিলাম, কি লইয়া ফিরিয়া যাইব। আমি পাছে আরও বিহ্বল হইয়া পড়ি, এই ভাবিয়া যে কত কষ্টে উনি আত্ম সম্বরণ করিয়া আছেন, তাহা এত কষ্টের মধ্যেও আমার বুঝিতে বাকী থাকিল না। এখানে থাকিলে পাছে উহাঁর কোন গুরুতর অসুক হয় এই ভাবিয়া আমি আর গিরিডিতে থাকা শ্রেয়স্কর মনে করিলাম না। কাঁদিয়া আমার বুকের ভার তবু কতক লাঘব হইয়াছে, কিন্তু উনি যে এই অভাগিনীর ভয়ে কাঁদিতেও পারিতেছেন না। তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম!

৭

অগ্রহায়ণ মাসের ১৩ই তারিখ রবিবার, নন্দবাবু আমাদিগকে লইয়া মধুপুর চলিলেন। আমরা বেলা ২½টার সময় বোম্বে মেলে কলিকাতা হইয়া বাড়ী যাইব, এই ইচ্ছা করিয়াছিলাম। স্নানাহার অন্তে ১০টার সময় গিরিডি ত্যাগ করিয়া বেলা প্রায় ১২টার সময় মধুপুর উপস্থিত হইলাম এবং ষ্টেশনের নিকট এক শালবনে বসিয়া বোম্বে মেলের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

মেইলগাড়ী আসিবার আর ১৫ মিনিট মাত্র বাকী আছে,—আমরা ওভারব্রিজ দিয়া ডার্ডন প্লাট ফরমে যাইতেছি, এমন সময় ডাক বাঙ্গালার দিকে আমার দৃষ্টিপাত

হইল। সহসা দেখিলাম, নীলখিয়ার মত কে যেন একটী ছেলে কোলে করিয়া ষ্টেশনের দিকে আসিতেছে! তখন ষ্টেশন ভরা লোক, কেহ আসিতেছে, কেহ কেহ যাইতেছে, কেহ বসিয়া আছে। কিন্তু আমার তখন যেন বাহ্য জ্ঞান রহিত হইয়া গেল, আমি দেশ কাল সব বিস্মৃত হইলাম এবং "ঐ আমার খোকা," বলিয়া চীৎকার করতঃ ওভারব্রিজের উপরেই পড়িয়া গেলাম। তারপর যে কি ঘটিল, তাহা স্মরণ হইতেছে না!

ক্রমশঃ

শ্রীমতী শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ।

বালবিধবা।

তোমরা কি নহ তবে সৃষ্টি বিধাতার?
চিরদিন এ অতৃপ্তি চির হাহাকার—
তোমাদের ক্ষুদ্র বুকে
চিরদিন মনোসুখে
নির্ম্মম দানব মত করিতে বিহার?
আমাদের কত আছে
তোমরা তাহার পাছে
অন্ধ মত—ফের বার বার।
তোমরা কি নহ তবে সৃষ্ট বিধাতার?

২

চিরদিন অভিশপ্ত
নীরব ব্যাকুল স্তব্ধ
রঙ্গময় বিশ্বকোণে পড়ি শতদিন
একটী রহস্য মত
দিবস যামিনী যত
বৃথা ফুটি উঠ চোখে বৃথা হবে লীন!
প্রতিদিন কত হাসি
নিতি বাজে কত বাঁশি
কত গান ঝঙ্কারিয়া বাজে কত বীণ্
কেবল অনাথা মত
আন মনে অবিরত
চেয়ে থাক মুখপানে নেত্র দীপ্তিহীন!

৩

কত কথা কাণাকাণি
সোহাগের কত বাণী
আমরা বলিয়া যাই—নাহি তার অধিকার
এ সংসারে এত দুঃখ জগদীশ! বিধবার
(জগদীশ)
কি মহা উদ্দেশ্য তব
কিবা কার্য্য অভিনব
হবে নাম সম্পূরণ, পায়ে দলি শতবার
তোমার পবিত্র করে গাঁথা যেই পুষ্পহার!
জীবনের একদিনে
সুখের বসন্ত সনে
না ফুটিতে ফুলকলি—কথা না কহিতে হায়!
ভেঙ্গে গেল এক স্বপ্ন—এক মহাঝটিকায়।

৪

তারপর কতদিনে
চাহি দূরে শূন্য মনে
নিরালা আঁধার বহি কত দৃঢ় সাধনায়
একাকী এ সিন্ধু-পারে
বালুগৃহ স্তরে স্তরে
গড়িয়াছ ভেঙ্গে গেছে সমাজ-তরঙ্গ ঘায়!
কতদিন! কতযুগ! চলিবে এমনি হায়!

শ্রীদুর্গাদাস ঘোষ।

কৃষিকার্য্য।

ধান্য, গোধূম, যব প্রভৃতি শস্য খাইয়া কোন কোন লোক প্রাণধারণ করে। এই সমুদয় শস্য ঘাসের বীজ ব্যতীত আর কিছুই নহে। অতি প্রাচীনকালে এই সকল ঘাস মাঠে ও জলায় আপনা আপনি জন্মিত ও যথাকালে ফুল ও ফল প্রসব করিয়া মরিয়া যাইত। বন্য অবস্থায় ঘাসে অধিক ফল হয় না। মানুষ দেখিল যে, যদি ভূমি কর্ষণ করিয়া এই সমুদয় উদ্ভিদ্‌কে রোপণ করা যায়, ও সাবধানে তাহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে অধিক শস্য লাভ হইতে পারে। মানুষ তাহাই করিল। এই পরিশ্রমের ফলে পূর্ব্বে যে ভূমিতে একজন লোক প্রতিপালিত হইত। এখন সেই ভূমিতে দশ জন লোক প্রতিপালিত হইতে লাগিল। আবশ্যকীয় উদ্ভিদ্‌কে সাবধানে প্রতিপালন করাকে কৃষিকার্য্য বলে।

উদ্ভিদের জীবন আছে। জীব জন্তুর ন্যায় ইহারাও জন্মগ্রহণ করে, পরিবর্দ্ধিত হয় ও অবশেষে মরিয়া যায়। অন্য জীব জন্তুর ন্যায় ইহারাও আহার করে। ভাল আহার পাইলে ইহাদের শরীরও সবল হয়। সবল উদ্ভিদে অধিক ফল হয়। কি ভাবে ভূমি কর্ষণ করিলে, কিরূপ আহার প্রদান করিলে উদ্ভিদ্ হইতে অধিক ফল লাভ হয়, কৃষিকার্য্য করিতে হইলে সে সমুদয় বিষয় বিশেষ রূপে জানা আবশ্যক।

এই সম্বন্ধে ইংরেজেরা অনেক নূতন জ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই জ্ঞানের প্রভাবে তাঁহাদের দেশে পূর্ব্বে যে ভূমিতে পাঁচ জন লোকের আহার উৎপন্ন হইত, এখন সেই ভূমিতে দশ জন লোকের আহার উৎপন্ন হইতেছে। ভারতের লোককে এই সমুদয় নূতন জ্ঞান শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ইংরাজেরা অনেকগুলি কৃষিবিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছেন। জীবের প্রধান প্রয়োজন আহার। যে মহাত্মাগণ নানা জ্ঞান প্রদান করিয়া ভারতবাসীর আহারের সংস্থান করিয়া দিতেছেন, তাঁহাদিগের নিকট বিশেষরূপে আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

জল না পাইলে উদ্ভিদ্ মরিয়া যায়। নীরস শুষ্ক ভূমিতে উদ্ভিদ্ জন্মে না। পশ্চিমাঞ্চলে অনেক ভূমি জল অভাবে পতিত হইয়াছিল। সেই মরু প্রান্তরে সর্ব্বদাই বালুকারাশি ধুধু করিয়া উড্ডীয়মান হইত। ইংরেজেরা খাল কাটিয়া সে স্থানে এক্ষণে জল আনয়ন করিয়াছেন, যে স্থানে পূর্ব্বে একটী তৃণও জন্মিত না, এখন সেই স্থানে লক্ষ লক্ষ মন গোধূম উৎপন্ন হইতেছে। যে স্থানে পূর্ব্বে একজন লোকেরও বাস ছিল না, এখন সেই স্থানে লক্ষ লক্ষ কৃষকের বাস হইয়াছে।

বিদেশ হইতে নানা প্রকার নূতন বস্তু আনিয়া ইংরেজ আমাদিগের মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। গোল আলু পরম উপকারী বস্তু। গোল আলু না হইলে আমাদের

এখন একদিন চলে না। কিন্তু শুনিলে তোমরা আশ্চর্য্য হইবে যে, দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে এ দেশে গোল আলু ছিল না। গোল আলু, বাঁধা কপি ও ফুল কপি ইংরেজ এ দেশে আনিয়াছেন।

আমাদের বনে চায়ের গাছ আপনা আপনি জন্মিত। তাহার কেহ চাষ করিত না, তাহা হইতে এ দেশের লোক এক কপর্দ্দকও লাভ করিত না। ইংরেজ এখন সেই চা গাছের চাষ করিয়া কোটি কোটি টাকা বিদেশ হইতে এ দেশে আনয়ন করিতেছেন। লক্ষ লক্ষ অন্নক্লিষ্ট নরনারীগণ এখন সেই টাকায় প্রতিপালিত হইয়া সুখে দিনপাত করিতেছে। যে সমুদয় নিবিড় বনে কেবল বাঘ ভল্লুকের ভীষণ গর্জ্জন ও হস্তী বরাহের আস্ফালন ব্যতীত আর কিছুই শ্রুত হইত না, এখন ইংরেজের প্রভাবে সেই সমুদয় স্থানে জনাকীর্ণ নগর, উপনগর ও গ্রাম সমূহ স্থাপিত হইয়াছে। আরব দেশ হইতে ইংরেজ কাফি নামক এক প্রকার উদ্ভিদ্ এ দেশে আনয়ন করিয়াছেন। ভারতের উত্তর খণ্ডে যেরূপ চা, দক্ষিণ খণ্ডে সেইরূপ কাফির চাষ করিয়া বহুসংখ্যক লোক প্রতিপালিত হইতেছে।

এ দেশে নানা স্থানে ম্যালেরিয়া জ্বরে লোক নিদারুণ কষ্ট ভোগ করে। সহস্র সহস্র লোক এই রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনেক পরিশ্রম করিয়া ইংরেজেরা আবিষ্কার করিয়াছেন যে এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম জীবাণু রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলে এই রোগের উৎপত্তি হয়, এবং এক জাতীয় মশক এই জীবাণুকে এক মনুষ্য-শরীর হইতে অন্য মনুষ্য শরীরে লইয়া যায়। অনেক স্থানে ইংরেজ নানা উপায়ে এই মশককুলকে নির্ম্মূল করিয়াছেন, ও সেই অবধি সেই স্থান হইতে ম্যালেরিয়া জ্বরও অন্তর্হিত হইয়াছে। সিন্‌কোনা নামক এক প্রকার বৃক্ষের বল্কল ও তাহা হইতে প্রস্তুত কুইনাইন নামক দ্রব্যের গুণে শরীর হইতে ম্যালেরিয়া জ্বরের জীবাণু দূরীভূত হয় ও মানুষ এই রোগের নিদারুণ যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করে। পেরু নামক দেশ এই বৃক্ষের জন্মস্থান। পূর্ব্বে সেই দেশ হইতে এই মহৌষধ এ দেশে আনীত হইত ও এত অধিক মূল্যে বিক্রীত হইত যে, সাধারণ লোকে ইহা ক্রয় করিতে পারিত না। ইংরেজ এখন এ দেশে সিন্‌কোনা বৃক্ষের চাষ করিয়াছেন। তাহা হইতে এখন রাশি রাশি কুইনাইন প্রস্তুত হইয়া অতি সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। এই মহৌষধের প্রভাবে এক্ষণে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণরক্ষা হইতেছে।

এইরূপে যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই ইংরেজের অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া আমরা চমকিত হই। এই প্রাচীন আর্য্যভূমি পুনরায় সুখ ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ হইবে সেই উদ্দেশেই বোধ হয় জগদীশ্বর ইংরেজকে এ দেশের কর্ত্তৃত্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

৺ নলিনীবালা জীবনী।

আমার আনন্দ দেহে তমসা ঢালিয়া।
শুভ্র কিরণের ছটা গিয়েছে নিভিয়া।
বধূ বেশে যেই দেশ আলো করেছিলে,
তাতেও তমসা ঢেলে কোথায় লুকালে?
সর্ব্বদা স্মরিছি তব মহিমা প্রকৃত।
অঙ্কিত এ মর্ম্মতলে ও মধু মুরতি॥
অই নাম মধুরতা সদা কাণে ঢালে।
দগ্ধ হৃদি স্নিগ্ধ হয়, শান্তির সলিলে॥

নলিনী বালার ১০ মাস বয়সের সময়ে আমাদের ১১ নং সাউথ সার্কুলার রোডের গৃহে ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেন মহাশয় তাহার নামকরন কার্য্য সম্পন্ন করেন। এই আনন্দজনক শুভ কার্য্য মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল। কোমল বালিকা দীর্ঘকাল ব্যাপি উপাসনা সময়ে প্রফুল্লভাবে আচার্য্যদেবের কোলে বসিয়া হাসি বিতরণ করিয়া সমাগত আত্মীয় বন্ধুগণের অসীম আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিল। আচার্য্য দেবও নিজ স্বভাব সিদ্ধ ঋষি তুল্য গম্ভীরতা বিস্মৃত হইয়া যে ভাবে সকলের সহিত আমোদ প্রমোদ ও রহস্য পূর্ণ সদালাপ করিতে করিতে ভোজনাদি করিয়া গভীর রজনী পর্যন্ত আমাদের আলয়ে আনন্দ বিতরণ করিয়াছিলেন তাহা লক্ষ্য করিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। পরম শ্রদ্ধাস্পদ দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী মহাশয় নামকরণ উপলক্ষে এই নূতন মনোহর সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন।

"আয়রে শিশু!——
আয়রে কোলে জুড়াই জীবন।
দেখে দেখে প্রাণ ভরে ও সুধাংশু বদন॥
মধুর তনুর রুচি, হস্ত পদ কচি কচি,
কচি মুখে কাঁচা হাসি কি সুন্দর দরশন॥
আহা কি মধুর বুলি, আধ আধ কথাগুলি,
নিয়ত এ কর্ণে যেন করে সুধা বরষণ॥
ভেঙ্গে ভেঙ্গে আসে আঁখি, মাতৃ অঙ্কে শির রাখি
নির্ভয় নিশ্চিন্তভাবে শিশু ঘুমাত যখন।
দুরাশা দুঃস্বপ্ন সব, এ সুখের নিদ্রা তব,
ভাঙ্গেনা করিতে নিশি, অশ্রুজলে উত্থাপন,
পবিত্রতা দেহ মাখা, এখনো কলঙ্ক রেখা
পড়েনি কোমল অঙ্গে যেন পড়েনা কখন।
বুঝিলাম দগ্ধ প্রাণ, এই জুড়াবার স্থান
দম্পতী-প্রেমের অতি দৃঢ়তর নিদর্শন।
যে গৃহে অভাব তোর, সে গৃহে শ্মশান ঘোর
অতি ভাগ্যে এ সংসারে মিলে এ মহা-রতন

নলিনীবালার এই কন্যারত্নের জন্মাবধি তাহাকে নিজের মহান্ উন্নত ও পবিত্র আদর্শে গঠিত করিতে অনুক্ষণ সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহার জীবনের অসাধারণ দুর্লভ শক্তিগুলি প্রিয়তমা কন্যা নলিনী বালার শৈশব জীবনেই এতদূর পরিস্ফুট হইতেছিল যে তাহা লক্ষ্য করিয়া আমাদের ধর্ম্মবন্ধুগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন। কলিকাতার কোলাহল ধর্ম্মজীবন গঠন পক্ষে একান্ত প্রতিকূল বোধ হওয়াতে আমরা দমদম

"Fairy Hall" নামে একটী পরম সুন্দর উদ্যানবাটিকা ক্রয় করিয়া তথায় আড়ম্বরবিহীন ধর্ম্মসঙ্গত জীবন যাপন করিতে বিশেষভাবে প্রয়াসী হই। এই সময় নলিনীবালার বয়স ৪-৬ মাস। সুধাংশু মোহনের বয়স ২ বৎসর ও সরোজ মোহন ১০ মাস বয়স্ক ছিল। আমরা অতীব সৌভাগ্যবলে অতর্কিত ঘটনাবলে এই পরম রমণীয় উদ্যানবাটিকার অধিকারী হইয়াছিলাম। সিন্ধু দেশের আমীরকে পরাজিত করিয়া ইংরেজরাজ তাঁহার অসংখ্য অনুচরসহ এই "Fairy Hall"এ সুদীর্ঘকাল বন্দীভাবে রাখিয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌ সিপাহীযুদ্ধে নিহত সার হেনরী ল্যরেন্সও অনেক কাল "Fairy Hall" বাস করিয়াছিলেন। অতীতের এত অলৌকিক কাহিনীপূর্ণ ভবনে বাস করিয়া সন্তানগণ সহ অতীব আনন্দ, স্বাস্থ্য ও ধর্ম্ম ভাব পূর্ণ জীবন যাপন পূর্ব্বক আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ভগবান্‌কে ধন্যবাদ জানাইতাম। ঐ বাটীতে গমনের ৪।৫ দিন পরই বঙ্কু মহাশয় ফৌজদারী মোকদ্দমা উপলক্ষে প্রায় এক বৎসর মেদিনীপুর ও কাঁথিতে বাস করিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করেন। আমার একটী কর্ম্মঠ মান্দ্রাজী ভৃত্য ও একজন হিন্দু চাকর মাত্র সম্বল ছিল। ব্রহ্মদৈত্যের বাড়ী বলিয়া কলিকাতায় ১৫।২০ জন ভৃত্যদের কেহই প্রাণের ভয়ে "Fairy Hall" এ যাইয়া কার্য্য করিতে সম্মত হয় নাই।

এই ঘোর নির্জনতাপূর্ণ জীবনে প্রিয় তমা নলিনীবালাই আমার একমাত্র সঙ্গিনী ছিল। অল্পদিনের চেষ্টায়ই তাহাকে বাঙ্গালা পুস্তক ও পত্রিকাদি অনুরাগের সহিত পাঠ করিতে শিখাইয়াছিলাম। সে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত শিয়রে মোমবাতি জ্বালিয়া "সখা সাথী" ও সরল বাঙ্গালা বই পাঠ করিতে অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল। কেবল তাহাই নয়, শিশু ভ্রাতা সুধাংশুকে মুখে মুখে অনেক কবিতা শিখাইতে চেষ্টা করিত, সংবাদপত্র ও বইর গল্পাদি তাহাকে এমন সরল ভাষায় বুঝাইত যে, তাহা লক্ষ্য করিয়া আমরা বিস্মিত হইতাম। ৪॥ বৎসরের কোমল বালিকা অসীম ধৈর্য্য সহকারে প্রাণের আগ্রহে প্রতিদিন এই কাজ করিতে ভুলিত না। জননীর সে অঞ্চলের নিধি ছিল। ঐ নির্জ্জনতার রাজ্য প্রকৃতির ক্রীড়াকাননে নলিনী জননীর সহিত একত্র স্নানাহার ভ্রমণ ও বৃহৎ বাগানের কার্য্যাদি লক্ষ্য করিয়া পাখীর মত সুললিত গান করিতে করিতে জীবন কাটাইত। তাহার কোমলতাপূর্ণ শৈশব-প্রকৃতিতে মাতৃভাব নিঃস্বার্থ ভাবের স্রোত, দীনতা ও বিনম্র ধর্ম্মভাব আপনা হইতে স্বর্গের অতুলনীয় শোভায় তাহাকে ভূষিত করিয়াছিল। তাহার প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ পক্ষে মানুষের চেষ্টায় যতদূর সম্ভব, স্নেহপ্রবণ পিতা তাহার কিছুই বাকী রাখেন নাই। অতি শৈশব কাল হইতেই নলিনী ও সুধাংশুকে গভীর রাত্রিতে শয়নাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক মুখে মুখে দুরূহ গণিত শিক্ষা দিতেন। আমার

স্বর্গগত পিতৃদেব ভগবান্ চন্দ্র বসু মহাশয়ের ভ্রাতা জগদীশ তাহাদিগকে বলিতেন,—এত রাত্রে পড়িতে যাইও না। চুপ করে শুয়ে থেকো।। সত্যপ্রিয় নলিনী উত্তর দিত,—না! জাগিয়া কি করে উত্তর না দিব ?"

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

১। রাত্রে শতধৌত ঘৃত বা নিমের পাতার রস ফেনাইয়া গাত্রে মাখিলে তৎক্ষণাৎ গাত্রদাহ নিবারিত হয়। আমলকী ঘৃতে ভাজিয়া কাঞ্জিকের সহিত পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে দাহ নিবারিত হয়।

২। কফজ্বরে কাস, শ্বাস, হিক্কা এবং প্লীহা যকৃৎ থাকিলে পিপুল চূর্ণ মধুর সহিত অবলেহ করিলে বিশেষ উপকার হইবে। ইহা বালকদের পক্ষে প্রশস্ত।

৩। কণ্টকারী, ব্যাকুড় (বৃহতী) শুঁঠ ধনে, দেবদারু ইহাদের প্রত্যেক ।৴২ ছয় আনা দুই রতি, জল ॥০ অর্দ্ধসের, শেষ ৵০ অর্দ্ধ পোয়া। ইহা সেবনে সকল প্রকার জ্বর নিবারণ হয়।

৪। জ্বরে অরুচি হইলে সৈন্ধব লবণের সহিত গরম আদার রস, অথবা সৈন্ধব লবণের সহিত ছোলঙ্গ নেবুর কেশর মুখে ধারণ করিলে রুচি হয়।

৫। অর্শে—রক্ত চিতামূলের ছাল বাটিয়া তদ্দ্বারা একটী কলসীর অভ্যন্তর ভাগ লিপ্ত করিবে। শুষ্ক হইলে ঐ কলসীতে দধি পাতিয়া অথবা ঘোল প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে অর্শ বিনষ্ট হয়।

৬। রক্তার্শে—পদ্মকেশর, মধু, দধির টাট্‌কা মাখন, চিনি ও নাগকেশর একসঙ্গে সেবন করিলে রক্তার্শ নিবারিত হয়। আপাঙের বীজ চাউলের জলে বাটিয়া পান করিলে রক্তার্শ বিনষ্ট হয়।

৭। স্ত্রীলোকের বাম হস্তে এবং পুরুষের দক্ষিণ হস্তে হরীতকীর বীজ ধারণ করিলে বসন্ত রোগ হয় না।

৮। রুদ্রাক্ষচূর্ণ ও মরীচচূর্ণ বাসি জলের সহিত সেবন করিলে তিন দিবসে বসন্ত প্রশমিত হয়।

নূতন সংবাদ।

১। ভূমিকম্প—গত ১৭ই জানুয়ারি ১০টা ২০ মিনিটের সময় মজঃফরপুরে ভূমিকম্প হয়। ঐ রাত্রেই ১০টা ৩২ মিনিটের সময় মুঙ্গেরে এবং ১০টা ৩৫ মিনিটের সময় ভাগলপুরে ভূমিকম্প হইয়াছিল। ফোরবেশগঞ্জ এবং আররিয়া

হইতেও ১০।০টার সময় ভূমিকম্প হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এসিয়া মাইনর প্রদেশেও পুনঃ পুনঃ ভূমিকম্প হইতেছে। ১৭ই ফেব্রুয়ারি প্রত্যূষে স্মার্ণার ভূমিকম্পে বহু গৃহ ধ্বংস হইয়াছে। পোর্টোরিকো সহরেও বিস্তর অনিষ্ট হইয়াছে। ১৮ই ফেব্রুয়ারির সংবাদে জানা যায় ঐ দিন আবার আসিয়া মাইনরের শিবাজ পল্লীতে বিষম ভূমিকম্প হইয়াছিল। ইহাতে ৪৩০ খানি বাটী একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং ৪৪২ খানি বাটী আংশিক রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

২৩শে জানুয়ারি বিলাতের ভূমিকম্প-জ্ঞাপন যন্ত্রাদিতে প্রকাশ হইয়াছিল যে আড়াই হাজার মাইল দূরে পূর্ব্ব দেশে ঐ দিন কোথাও ভূমিকম্প হইয়াছে। প্রকাশ যে, ঐ ভূমিকম্প পারস্য দেশের কুহিস্তান প্রদেশে সংঘটিত হইয়াছিল। এই ভূমিকম্পে ৬০খানি গ্রাম একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে এবং কতকগুলি গ্রাম ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়াছে। ইটালী মেসিনার ভূমিকম্পের পর ভূমিকম্প স্রোত যেন প্রবাহিত থাকিল।

২। বোম্বাই বিদ্যালয়ে বাণিজ্যবিষয়িণী শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বিগত ১৬ই ফেব্রুয়ারী বোম্বাই প্রদেশের গভর্ণর সার জর্জ্জ ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কন্ভোকেশন' উপলক্ষে বলিয়াছেন,—বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্যবিষয়িণী শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য বাণিজ্যতত্ত্বে অভিজ্ঞ ও বহুদর্শী এক জন ইংরেজ অধ্যক্ষ ও দুই জন দেশীয় অধ্যাপকের নিয়োগ আবশ্যক। এই জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাণ্ডারে অন্যূন তিন লক্ষ টাকা সঞ্চিত থাকা আবশ্যক। কয়েকজন ভারতবাসী লণ্ডনের "স্কুল্ অফ্ ইকনমিকস্ নামক বিদ্যালয়ে বাণিজ্য-বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য প্রেরিত হইবেন। গবর্ণমেণ্ট এই জন্য চারি পাঁচটি বৃত্তির ব্যবস্থা করিবেন। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রেরা বাণিজ্য বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া দেশে ফিরিলে, তাঁহাদের মধ্যে যোগ্যতর দুই জন অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইবেন। আগামী শরতে বাণিজ্য-বিদ্যায় বিশারদ এক জন ইংরেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য-বিদ্যা-বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইবেন। তিনি কিছু কাল ভারতীয় বাণিজ্যের অবস্থার আলোচনা করিয়া অভিজ্ঞ হইয়া বাণিজ্যশিক্ষার পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করিবেন। বোম্বাই নগরের একজন বদান্য নাগরিক বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য শিক্ষার প্রবর্ত্তনের জন্য ইতিমধ্যেই দুই লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

৩। নবীনচন্দ্র সেনের কবিতা এবং বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার প্রভাব এই সম্বন্ধে যে দুই জনের বাঙ্গলা প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, চৈতন্য লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে দুইখানি রৌপ্যপদক পুরস্কার দিবেন। আগামী ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে চৈতন্য লাইব্রেরির সম্পাদক, বিডন-ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে।

বামারচনা।

অভিতপ্ত।

দাঁড়ায়ে মোরা
আজও রয়েছি যে পথে,
কত যায় কত আসে
দিবানিশি বর্ষশেষে,
রেখেছে সম্বন্ধ তারা সংসারের সাথে।

মুখে মুখে মনে মনে,
ডাকিতেছি সংগোপনে,
বহিয়া অসহ ভার দুরবল মাথে।
নীরবে চাহিয়া বিশ্ব,
হেরিতেছে দশা নিঃস্ব,
কহেনা আশার বাণী আসেনা নিকটে।
ভিখারী আমি গো পান্থ,
নিরাশায় মতিভ্রান্ত,
চিরতরে সর্ব্বস্বান্ত পড়েছি বিভ্রাটে।

দাঁড়ায়ে আছি গো পথে,
হয় যদি তব সাথে,
একবার পরিচয় আবার জগতে।
তুলে লব মাথা পেতে,
জীবনের সুপ্রভাতে
আশীর্ব্বাদী পুষ্প সম ভক্তি পূর্ণ চিত্তে।

পাষাণে বাঁধিয়া হিয়া
অতীতের স্মৃতি দিয়া,
বহিতেছি অভিতপ্ত প্রাণ এ মহীতে।
ভবিষ্যৎ অন্ধকার,
বহায় নয়নধার,
খুঁজে খুঁজে পথ নাহি পাই চারি ভিতে।

সর্ব্বজ্ঞ আছেন যিনি,
পথিক-সহায় তিনি,
ভিখারীর ধন তুলি দেন হাতে হাতে।
আজও তাহারি আশে রয়েছে পথে।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

মরমের উপহার

প্রকৃতি লো! খুলে দিছি ?
মরমের গুপ্ত অভিধান,
মুকুলিতা আশা-লতা
হয়ে গেছে শুক ম্রিয়মাণ।

নিয়মের কি পরিবর্ত্তন!
কি আবর্ত্তে যেতেছে ছুটিয়া,
মানেনা সে বাধা বিঘ্ন,
কোন্ স্রোতে যায় গো ভাসিয়া।

প্রকৃতি! তোমারি বক্ষে
অতীতের সেই চুম্ দান—
অতীতে বিলীন কিন্তু
মরমের নহে অবসান।

রেখেছিনু লুকাইয়া
মরমের গুপ্ত আরাধনা,
পরিণামে সাথী হ'ল
কলঙ্কিত দুঃখ আবর্জ্জনা।

ধর দেবি! সুরঞ্জিত
প্রণয়ের প্রীতি উপহার,
এ আরব্ধ জীবনের
শুষ্ক মৃদু ঝিল্লীর ঝঙ্কার।

বাজিবে ঐ ভাঙ্গা বীণ,
আকণ্ঠ পূরিত মৃদু গান,
চরণে সাধিবে তব
প্রণয়ের মান অভিমান।

বাজিবে পঞ্চমে দূর
সুখময়ী বাঁশরীর তান,
মরমের পাশাপাশি
করি এক নব ব্যবধান।

শ্রীমতী প্রিয়বালা রায়।

ভিক্ষা

বিভু!
সত্যই ভাঙিবে যদি
ক্ষুদ্র এই নারী-হৃদি
যাতনা সহিতে তবে দাও গো শকতি?
ভাঙ এ সংসার-কারা
মুছে ফেল অশ্রুধারা
মরম ভরিয়া দাও বিশ্বাস ভকতি।
পাপের কলঙ্কছায়া
আবরিছে হীন কায়া
নাশো গো এ তমোময়ী অন্ধকাররাশি,
সাধের সে মালা গাঁথা
সুখময়ী প্রেমগাথা
সুদূর অনন্ত মাঝে গিয়াছে গো মিশি।

ভেঙে দাও ক্ষুদ্র হৃদি
ওগো দয়াময় বিধি!
মুছে ফেল কলঙ্কের কালিমা পশরা,
ক্ষুদ্র এ হৃদয়-কূপে
বিরাজিও ধ্রুব রূপে
এ পূজার উপহার প্রেম-অশ্রুধারা।
শুধু এই ভিক্ষা নাথ!
থেকো তুমি সাথ সাথ,
বিপদে সম্পদে যেন নাহি হই হারা,
তব প্রেমামৃত পানে
মরে বেঁচে থাকি প্রাণে
নাশ গো এ মরমের তিমির-পশরা।

শ্রীমতী প্রিয়বালা রায়।

২৯।৩ মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 547. March, 1909.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৬ বর্ষ। ৫৪৭ সংখ্যা। { ফাল্গুন, ১৩১৫। মার্চ, ১৯০৯। } ৯ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

শিল্পবিদ্যালয়—দিঘাপতিয়ার মহারাজা রাজসাহিতে রেশম বুনান ও রন্ধনের শিক্ষা দিবার জন্য এক শিল্পবিদ্যালয় স্থাপন করিতেছেন।

ভূতপূর্ব্ব বড়লাটের দান।—ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড কর্জ্জন আগরার তাজমহলের জন্য মিশরের নির্ম্মিত একটী আলোকাধার উপহার দিয়াছেন। যুক্তপ্রদেশের ছোটলাট উক্ত আলোকাধার স্থাপন-ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছেন।

অনাথাশ্রম—মিঃ থে ভেঙ্কাটারাও নামবেল্যঙ্গী প্রদেশস্থ জনৈক উকীল অনাথ বালক বালিকাদিগের জন্য এক আশ্রম নির্ম্মাণার্থ দশ হাজার টাকা মূল্যের জমী ও বাড়ী এবং নগদ দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

ব্যারিষ্টারি পরীক্ষা।—বিলাতের গত ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায়—২৫টী ভারতবাসী যুবক উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

শিল্পপ্রদর্শনী—যশোহর কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীতে নলডাঙ্গার রাজাবাহাদুর স্বহস্তে নির্ম্মিত একখানি মোটর গাড়ী ও লৌহপিঞ্জর প্রদর্শন করিয়াছেন। রাজাবাহাদুর স্বহস্তে অনেক জাহাজের কল ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিতে বিশেষ পারদর্শী।

ধর্ম্মসংঘ—কলিকাতা টাউন হলে আগামী ৯ই, ১০ ও ১১ই এপ্রেল গুড-ফ্রাইডের অবকাশ সময়ে ধর্ম্মসংঘের অধিবেশন হইবে। এতদুপলক্ষে নানা স্থানের ধর্ম্মনেতাদিগকে আহ্বান করা হইতেছে।

ভূগর্ভে কামান—পূর্ব্ববঙ্গ কামার গাঁ গ্রামে এক কৃষক হলকর্ষণের সময় ভূগর্ভ-মধ্য হতে ৭টী কামান পাইয়াছে। উক্ত

কামানের গায়ে ইসা খাঁর, নাম লিখিত আছে।

খাসিয়া পাহাড়স্থ ব্রাহ্ম মিসন—খাসিয়া পাহাড়ে প্রায় কুড়ি বৎসর হইল পার্ব্বত্য খাসিয়া জাতির কল্যাণার্থ একটী ক্ষুদ্র মিসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় অশেষ ক্লেশ এবং অসুবিধা স্বীকার করিয়া এই সময়ের মধ্যে অনেকগুলি সদনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টাতে অনেক লোকে ভূতপ্রেতের পূজা পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। তিন স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বালক বালিকাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় খুলিয়া তাহা হইতে তিনি ঔষধ বিতরণ করিতেছেন। একজন খাসিয়া যুবক কলিকাতাস্থ ডাক্তার এম্ এম্ বসুর হোমিওপ্যাথিক স্কুল হইতে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই চিকিৎসালয়ের ভার লইয়াছেন। সে দেশে চিকিৎসার বিশেষ উপকার না থাকাতে এই চিকিৎসালয়ের দ্বারা লোকের অশেষ উপকার হইতেছে এবং ঔষধ লইবার জন্য ১৫।২০ মাইল দূর হইতে লোক আসিতেছে। কতকগুলি স্ত্রীলোককে সামান্যরূপ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে; তাহাদের দ্বারা অপর স্ত্রীলোকদিগের উপকার হইতেছে। বালকবালিকাদিগকেও নীতিশিক্ষা দেওয়া হইতেছে। যাহারা ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা মদ, গাঁজা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়াছেন নীলমণি বাবুর চেষ্টায় অনেক স্থানে মদ বিক্রয় বন্ধ হইয়াছে। নীলমণি বাবু দীর্ঘকাল আন্দোলন করিয়া গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করাতে শিক্ষাবিভাগের অনেক প্রকার সংস্কার সম্পাদিত হইয়াছে। তিনি এই পাহাড়ে শিল্প, বাণিজ্য এবং কৃষিকার্য্যের উন্নতি এবং বিস্তার সম্বন্ধেও চেষ্টা করিতেছেন। দুর্ভাগ্য লোকের ওলাউঠায় ও অন্যান্য বিপদ ও অত্যাচারের মধ্যে তিনি সর্ব্বদা তাহাদের সহায়তা করিতে যত্ন করিয়াছেন। চারিজন খাসিয়া যুবক তাঁহার সহকারীরূপে তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়া সকল কার্য্যে তাঁহার সহায়তা করিতেছেন; কিন্তু একটী জাতির উন্নতি সাধনের জন্য আরও কার্য্য করিবার লোক এবং অর্থের প্রয়োজন। চারিদিক হইতে লোক আসিয়া আপন আপন গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন এবং অন্যান্য কার্য্যের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছে। কিন্তু তিনি অর্থাভাবে কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত করিতে পারিতেছেন না। খাসিয়ারা ভারতবাসী, আমাদেরই স্বদেশীয়। তাহাদের মধ্যে যাহাতে শিক্ষা নীতি এবং ধর্ম্মের বিস্তার হয় এবং অন্যদিকে শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি হয়, সে সম্বন্ধে আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করা উচিত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই জাতির কল্যাণের জন্য এ মিশন স্থাপন করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। আশা করি, নীলমণি বাবুর নিঃস্বার্থ কার্য্যে বিস্তার ও উন্নতির